রূহে তাসাওউফ

(মা'রেফাতের মর্মকথা)

মূলঃ
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

উর্দূ অনুবাদঃ
মুফ্‌তী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

বঙ্গানুবাদঃ
মুহাম্মদ হোছাইন

পরিবেশনায়

হাফিজিয়া কুতুবখানা

২ নং, আদর্শ পুস্তক বিপনী বিতান
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা ১০০০।

অনুবাদক (মুফতী শফী সাহেব) –এর কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। "আমাছিলুল আকওয়াল" কিতাব খানার তরজমা শেষ করার তওফীক তিনি দান করেছেন। আমার ন্যায় ক্রটিযুক্ত অন্তরবিশিষ্ট অধমের দ্বারা এমন মহৎ কাজ আঞ্জাম পাওয়ার কথা ছিল না। সম্ভব ছিলনা ওসব মুরুব্বীয়ান কামিলগণের বাণীর তরজমা করা। কিন্তু আমার পথ প্রদর্শক আমার নির্ভরক্ষেত্র মূল প্রণেতা হযরত থানবী (রহঃ) যিনি আল্লাহর মেহেরবাণীতে সেসব কামিলগণের একজন, তাঁর হুকুমে আমি এ সৌভাগ্যের প্রত্যাশী হয়েছি যে, হয়তো আল্লাহ্ পাক সেসব কামিল বুযুর্গগণের বাণীর বরকতে এ অধমকে সংশোধন করে দেবেন। এটুকু আল্লাহ্ পাকের জন্য কঠিন কিছু নয়। কবি যথার্থই বলেছেন–

ان المقا دیر اذاساعدت = الحقت العاجزبالغادر

অর্থ ঃ তাকদীর যদি সৌভাগ্যাশ্রিত হয়, তখন দুর্বলও কিন্তু সবলে পরিণত হয়। এ অনুবাদ হতে ১৬ ই শাবান ১৩৫৯ হিজরী অবসর হয়েছি। তখন এ গুণাহ্গারে পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে চলছিল। এটি এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার – এ লেখাটিও আমার পঁয়তাল্লিশতম রচনা। কিছু ফারসী কবিতা যা অনায়াসে রচিত হয়েছে তার উপরই খতম করছি।

اے کہ پنج وچهل بنا دانی – داد رغفلت وهوس دانی

হে মানুষ! যে অজ্ঞতার সাথে অলসতা এবং প্রবৃত্তি পূজায় পঁয়তাল্লিশটি বছর অতিক্রান্ত করেছে।

شکر نعمت بمعصیت داری – عذر تقصیر هیچ نه نهادی

নেয়ামতের শোকর গুনাহর দ্বারা আদায় করেছ। অপরাধের ক্ষমায় কিছুই রাখনি - **ضعف پیری رسید و درلعبی + وائے این هے هشی هوالعجبی**

তমাশায় বার্ধক্যের দুর্বলতা এসে পৌছলো, হে মানুষ এটি অচৈতন্য ও অদ্ভুত নয় কি ? **حسرت هین نذیر شیب رسید + وعظ حق یه هین رغیب رسید**

তোমার শিরে বাধক্যের ভীতি প্রদর্শনকরী স্পষ্ট, হক উপদেশ অদৃশ্য হতে কাছে এর পৌছলো। **پنج باقی مگر نگه داری – توبه ازکرد هاهکف داری**

মাত্র পাঁচ বাকী, কিন্তু লক্ষ্য রেখো ! কৃতকর্মের তাওবা হাতে রেখো এবং সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহর যার ইয্যত ও পরাক্রমশীল তার বদৌলতে সমস্ত কল্যণময়ী কাজ আঞ্জাম পায়।

বান্দা মুহাম্মদ শফী
খাদিম দারুল উলুম
১৬ শাবান ১৩৫৯ হিঃ দেওবন্দ।

সূচীপত্র

বিষয় — **পৃষ্ঠা**

প্রথম অংশ

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত কয়েকটি বই

- সত্যের সন্ধান। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- মেশকাতুল আনওয়ার। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- হেদায়াতের আলো। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- আদাবুন্ নবী। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- সৃষ্টি দর্শন। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- সিয়াম-সাধনা (শান্তির পথ)। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- সত্যিকারের সম্পদ। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- মুকাশিফাতুল কুলূব। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- মিন্হাজুল আবেদীন। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- হায়াতে ইমাম গায্যালী। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- খুলুক্কে মুসলিমিন। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন (সর্বখন্ড)। ইমাম গায্যালী (রহঃ)
- রূহে তাসাওউফ-(মা'রেফাতের মর্মকথা)

  মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)
- রেছালাতে নববী বা বিশ্বনবীর তিরোধান।

  মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
- যিয়াউল কুলুব – হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজের মক্কী
- মুসনাদে ইমাম আযম। আবু হানীফা (রঃ)
- নেয়ামতে কোরআন, মাও ঃ (হেসেন আলী)
- আরশের ছায়ায় –মাওলানা গরীবুল্লাহ্ মশরুর ইসলামাবাদী
- আহকামূল হজ্জ–হাফেজ আবুল বশার
- হজ্জ ওমরা ও জিয়ারতে মদীনা –হাফেজ আবুল বশর

তরীকতের শায়েখগণ সমন্ধে রিসালা-ই কুশায়রীয়া থেকে চয়নকৃত বিষয়বস্তু

তাসাউফের মূল কথাঃ আল্লামা কুশায়রী (রাহঃ) বলেন, আমি আহমদ ইবনে মুহাম্মাদের সূত্রে সাঈদ ইবনে উসমান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সু-প্রসিদ্ধ বুযুর্গ যুন্নুন মিস্‌রী (রঃ)-কে বলতে শুনেছি, তরীকতের (তাসাউফের মূলভিত্তি চারটি (১) সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহব্বত, (২) দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও দুশ্‌মনীভাব, (৩) আল্লাহ্ প্রেরিত ওয়াহী তথা কুরআনের তাবেদারী এবং (৪) অবস্থা পরিবর্তনের ভয়।

সূক্ষ্মতম রিয়া ঃ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত আউলিয়াদের অন্যতম হযরত ফুযায়ল ইবনে 'আয়ায বলেন, মানুষের কথা খেয়ালে আসার দরুন আমল ছেড়ে দেয়া মূলতঃ রিয়া। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা শিরকের অন্তর্ভূক্ত।

ফায়দা ঃ কোন কোন লোক আমল ছেড়ে দেয় এই হেতু যে, তার আমলে রিয়ার আশংকা আছে। এই প্রেক্ষিতে হযরত ফুযায়ল (রঃ) বলেন, এটিও ঠিক রিয়ারই একটি শাখা। আসল ব্যাপার হচ্ছে আমল করার সময় মানুষেরই উচিত, কারো দেখা বা না দেখার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করা।

গুণাহ্র প্রতিক্রিয়া ঃ হযরত ফুযায়ল ইবনে 'আয়ায (রঃ) বলেন, আমার দ্বারা কোন প্রকার গুনাহ্ হয়ে গেলে তার প্রতিক্রিয়া স্বীয় গাধা ও খাদিমের চরিত্রেও অনুভব করে থাকি। তারা তখন আমার অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়।

নিজেকে দু'আর মুখাপেক্ষী মনে করা ঃ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর বিশিষ্ট বুযুর্গ মারূফ কারখী (রঃ) একদা এক পানীয় বিক্রেতার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে বলছিল, যে আমার পানি পান করবে, আল্লাহ্ তার উপর রহমত করুন। মা'রূফ কারখী তখন রোযাদার ছিলেন। এই আওয়ায তাঁর কর্ণগোচর হলে অগ্রসর হয়ে তিনি পানি পান করে নিলেন। লোকজন আরয করল, আপনি কি রোযা রাখেন নি? বললেনঃ রোযা'তো রেখেছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, এ দু'আর দ্বারা আমার উপর রহমত করা হবে (যদ্দরুন রোযা ছেড়ে দিয়েছি। গ্রন্থকার থানবী (রাহঃ) বলেন, আমার ধারণা মতে সেটি নফল রোযা ছিল, আর সম্ভবতঃ নফল রোযা সম্পর্কে হযরতের এটাই মাযহাব ছিল, কোন কারণ ছাড়াই নফল রোযা ভঙ্গ করা যায়। যেমন ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম ইস্হাক (রঃ)-এর মাযহাব তাই ছিল। হাদীস ব্যখ্যাদাতা ইমাম নবভী এমনটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের মাযহাবেও বিনা কারণে যদিও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয কিন্তু রোযাটি কাযা করে নেয়াই উত্তম। কিন্তু হযরত মা'রূফ কারখীর দৃষ্টিতে তখন সে ব্যক্তির দু'আ লওয়াটাই উত্তম ছিল বিধায় তিনি রোযটি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পরিচয় বিলুপ্তির ফযিলত

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর খ্যতিমান বুযুর্গ হযরত বিশ্‌র হাফী (রঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি আখিরাতের স্বাদ লাভ করতে ব্যর্থ হবে, যে ব্যক্তি লোক সমাজে আত্ম-পরিচয় দিতে তৎপর থাকে।

পার্শ্ববর্তীর প্রতি সুদৃষ্টি রাখা ঃ

আমি উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (রাহঃ) থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ওয়ালীআল্লাহ্ হাতিম-ই আসম-এর নিকট জনৈক মহিলা একটি মাস্‌আলা জিজ্ঞেস করতে হাজির হয়। তখন হঠাৎ সে মহিলার থেকে সশব্দে বায়ূ বের হয়। এ কারণে মহিলাটি লজ্জা বোধ করতে থাকে। হযরত হাতিম (রঃ) তার এ লজ্জা অনুধাবন করে দেখাতে

লাগলেন, তিনি বধীর, তিনি যেন কানে শুনেন না। মহিলাকে বললেন একটু জোরে বল, কি বলতে চাচ্ছ?.

মহিলা যখন দেখল, তিন বধীর, তাই সে আওয়াজ শুনতে পাননি। তখন তার লজ্জার গ্লানিটুকু বিদূরীত হয়ে যায়। এর পর হতে এই বুযুর্গের নাম 'হাতিম আসম' (বধীর হাতিম) হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

'সামা' বা ধর্মীয় সঙ্গীতের আসক্তি ঃ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন খ্যতিমান সুফী ছিলেন হযরত আবু হাফ্স (রঃ)। তিনি বলেন, যখন তুমি কোন মুরীদকে দেখবে যে, সে সামার আগ্রহ পোষণ করে তখন জেনে রাখবে তার মধ্যে এখনো বাতুলতা ও মুর্খতার অংশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

আনন্দ ও নিরানন্দের যথার্থ উপকরণ ঃ

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইউসুফ ইবনে আসবাত (রঃ)- এর বিশিষ্ট শাগরিদ ইবনে হাবীক বলেন, কিয়ামতের দিনে যে বস্তু তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে অক্ষম, উহা ব্যতীত অন্য বস্তুতে সন্তুষ্ট হয়ো না। কেননা সুখ-দুঃখে এবং আনন্দ ও নিরানন্দে সে বস্তুই বিবেচনাযোগ্য যা অটুট ও চিরস্থায়ী। পার্থিব দুনিয়ার শান্তি যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি এর অশান্তিও ধর্তব্য নয়।

যেমন কবির ভাষায় ঃ

چنان نما چين نيز هم نه خواهد ماند

অর্থাৎ, এটি যেমনি ক্ষণস্থায়ী,

ওটিও তেমনি,

টিকে থাকার নয়।

এই জন্যই তো আওলীয়াগণের সুখ ও বেদনা একমাত্র আখিরাত কেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। **যেমন কবি বলেন ঃ**

گریه وخنده عشاق زجائے دگراست –

می سرایند شب ووقت سحر فرمویند .

হাসি-কাঁন্না প্রেমিক কুলের
অন্যত্র হতে উৎসারিত,
রাত্রি ভরে গায় তারা গান
প্রভাতে কিন্তু কাঁন্নারত।

মুরীদের অবস্থা ঃ

হযরত আবুল হাসান ইবনে সাইগ (মৃত–৩৩০হিঃ) -এর খিদমতে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে ছিল যে, মুরীদের অবস্থা কেমনটি হওয়া চাই? তিনি বললেন ঃ মুরীদের অবস্থা এমন হওয়া চাই যেমন হয়ে ছিল তবুকের যুদ্ধ হতে বিরত (তিনজন সাহাবীর। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের বাণী– সু-প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও যমীন তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে পড়ে ছিল।

এর অর্থ হচ্ছে, আখিরাতের চিন্তায় কোন মুহুর্তেই স্বস্তি না আসা। সব সময় চিন্তাযুক্ত মনে কাল যাপন করা এবং দেহ-মন, ভিতর-বাহির কোন দিকেরই শান্তি না থাকা।

শায়খদের থেকে ফায়েয হাসিলের নিয়ম ঃ

হযরত মুমশাদ দীনুরী (রঃ) (মৃত–২৯৯হিঃ) বলেন, আমি নিজেকে একমাত্র এ অবস্থায় রেখে শায়খের খেদমতে হাজির হয়েছি, যখন কল্বকে অন্য সব অবস্থা থেকে শূন্য করতে সক্ষম হয়েছি। একমাত্র তাঁর সাক্ষাৎ ও বাণী দ্বারা স্বীয় কল্বে ফায়েয লাভের প্রত্যাশী হয়ে হাজির হয়েছি। আর তার কারণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন শায়খের কাছে নিজস্ব অবস্থাতেই চলে যায়, তখন শায়খের মোলাকাত ও সাহচর্য এবং তাঁর বাণীর বরকত বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, তখন তাঁর নিজস্ব কোন গুণের দিকে দৃষ্টি দেয়া চাই না।

কারণ এ দৃষ্টি এক প্রকার দাবীরই সমতুল্য। আর এ দাবীর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে,

اناگیکه پرشد دیگر چون پرد –

যে পাত্রটি এমনি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সেটি আবার কিভাবে পূর্ণ করা হবে।

শায়খের প্রয়োজনীয়তা ঃ

হযরত আঃ ওয়াহ্হাব ছাকাফী (রহঃ) (মৃত–৩২৮) বলেন,যদি কেউ সর্ব প্রকার ইলমও হাসিল করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাহচার্যেও থাকে, কিন্তু যদি শায়খে কামেল কিংবা স্নেহশীল ইসলাহ্কারীর ছায়াতালে থেকে মুজাহাদাহ (সাধনা) না করে, তবে সে আল্লাহর খাস বান্দাদের দরজায় পৌঁছতে সমর্থ হবে না। কেউ যদি এমন একজন ওস্তাদের সান্নিধ্যে আদব ও তা'লীম হাসিল না করে, যিনি তার আমলে কি ত্রুটি রয়েছে ধরিয়ে দিতে সক্ষম, তা'হলে লেন-দেন ও কাজ -কারবারের সংশোধন কাজে তার অনুসরণ করা বৈধ নয়। কারণ, এ জাতীয় লোক উপরোক্ত বিষয়ে যেন নিম্নোক্ত প্রবাদটিরই উদাহরণ –

ازخویشتن گمره است – کرا رهبری کند ؟

যে ব্যক্তি নিজেই পথ হারা, সে অপরকে পথ দেখাবে কিরূপে।

পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতা ঃ

হযরত হামদুন (মৃত –২৭১ হিজরী) (রাহঃ) বলেছেন ঃ যার ধারণা এমন হবে যে, আমার নফস ফেরাউনের নফস অপেক্ষা উত্তম। মূলতঃ সে অহংকারই প্রকাশ করল। মুফতী শাফী সাহেব (মূল অনুবাদক)(রাহঃ) উপরোক্ত উক্তির বিশ্লেষণে বলেন, উক্তিটির সাধারণ অর্থ হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ কেউ দুনিয়া থেকে বিদায় না নেবে, ততক্ষণ এ নিশ্চয়তা আসতে পারে না যে, সে' ফেরাউন' অপেক্ষা উত্তম। কেননা, পরিণাম ফল কারো জানা নেই। তাহলে দলীল ছাড়া নিজেকে উত্তম মনে করা অবশ্যই

তাকব্বুরী এবং অহংকার । আহ্লে হাল আল্লাহ্ ওয়ালাগণ এটি কলবের দ্বারা অনুধান করে থাকেন। তাঁদের বেলায় উল্লেখিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। তবে নফস নিকৃষ্ট হলে কর্মও তেমনটি হওয়া অনিবার্য নয়। অবশ্য ব্যক্তির ঈমানী অবস্থা ফেরাউনের কুফুরী বিশ্বাস হতে নিশ্চিতই শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত। (হযরত থানবী (রঃ) এমনই বলেছেন।

বিনয়-নম্রতা অর্জনের তরীকা ঃ

হযরত হামদুন (রাহঃ) আরো বলেন, যে ব্যক্তি অতীত বুযুর্গগণের অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, তার স্বীয় ত্রুটি এবং আল্লাহ্র খাস বান্দাদের থেকে পেছনে থাকাটা অনায়াসে অনুভূতঃ হয়ে যাবে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক (সুশ্রী) বালকদের দিকে নজর দেয়ার অশুভ পরিণতি ঃ

হ্যরত যন্নুন মিসরী (রাহঃ)-সহ আরো কতিপয় শীর্ষস্থানীয় আওলিয়ার সুহবত অর্জনকারী মনীষী হযরত ইবনে জালা (রাহঃ) বলেন, একদা আমি আমার শায়খের সাথে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ে গেল একটি সুশ্রী বালকের প্রতি। সাথে সাথে আমি আমার শায়খের খেদমতে আরয করলাম, হযরত! এ ধারণা কি কখনো যুক্তিযুক্ত হতে পারে ? এহেন রূপ ও শ্রীর অধিকারী বালকটিকে আল্লাহ্ পাক আযাব দেবেন ? শায়খ বললেন, তুমি কি ছেলেটিকে (অন্য মন নিয়ে) দেখেছো ? যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তবে তোমাকে এর পরিণতি ভুগতে হবে অবশ্যই। ইবনে জালা (রাহঃ) বলেন, এ ঘটনার বিশ বছর পর প্রতিক্রিয়াটি প্রকাশ পেল। আমি কোরান বিলকুল ভুলে গেলাম।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া স্বেচ্ছায় দৃষ্টি দেয়ার কারণে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বীয় কর্মে সরলতা ও কঠোরতা একত্রিতকরণ ঃ

হযরত রুয়াইম ইবনে আহ্মদ (মৃত -৩০৩) বলেন, তত্ত্ববিদগণের প্রজ্ঞার দাবী হচ্ছে, কাজ-কারবার ও মুয়ামালায় স্বীয় ভাইদের বেলায়

উদারতা সরলতা প্রদর্শন করা আর নিজের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা। কেননা, অপরের প্রতি উদারতা দেখানো শরীয়তের আনুগত্য। আর নিজের নফস, তথা' প্রবৃত্তিকে কঠোর ভাবে শাসন করা তাকোয়ার নির্দেশ।

গুনাহ্ ও নেকীর প্রতিক্রিয়া ঃ

হযরত আবুল হাসান আলী মুহম্মাদ মুযাইয়্যেন (মৃত-৩২৮হিঃ) বলেন, এক গুনাহ্র পর দ্বিতীয় গুনাহ্টি যে মানুষ হতে সংগঠিত হয়, তা পূর্ববর্তী গুনাহ্রই তাৎক্ষণিক নগদ প্রতিফল। অনুরূপ একটি নেক কাজের পর অপর আরেকটি নেককাজের যে ভাগ্য হয়, তাও পূর্ববর্তী নেক কাজের তাৎক্ষণিক ও নগদ প্রতিদান।

মুশাহাদাহ্ (অর্ন্তদর্শন) এবং লজ্জতের (স্বাদ) মাঝখানে অসামঞ্জস্যতা ঃ

হযরত আবুল আব্বাস সাইয়ারী (রঃ) (মৃত- ৩৪৩ হিঃ) বলেন, কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিবেক থাকাকালীন অবস্থায় আল্লাহর মুশাহদাহ্ বা অর্ন্তদর্শন লাভের সময় লজ্জত বা স্বাদ লাভের অনুভূতি হতে পারে না। কেননা আল্লাহর প্রতি আত্মিক দর্শন বা মুশাহাদা লাভের সময় হচ্ছে স্বীয় নফসকে ফানা তথা বিলোপ করার সময়। তখন তো কোন প্রকার স্বাদের অবকাশই থাকে না।

উপরোক্ত কথার অর্থ হচ্ছে প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক স্বভাব জনিত স্বাদ। যা চারধাতুর অনুমিশ্রণের ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করে। এখানে রুহানী স্বাদ বা লজ্জত উদ্দেশ্য নয়। নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে তার যথার্থতা নির্ণিত করা সম্ভব । যেমন পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِى فِى الصَّلٰوةِ

আমার চোখের শীতলতা নামাজের মধ্যে নিহিত। (আল হাদীছ।)

উল্লেখিত উক্তি দ্বারা লজ্জত বা আত্মতৃপ্তির সন্ধানীদেরকে শায়খ -(রঃ) সতর্কতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন যে, তারা যেন এমন বিষয়ের পানে ছুটে না যায়। যা মূল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত নহে।

নিজের নাফসের পক্ষে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার নিন্দা ঃ

হযরত আবুল হুসাইন বন্দ ইবনুল হুসাইন শীরাযী (মৃত–৩৫৩হিঃ) বলেন, তোমরা স্বীয় নাফসের অনুকুলে ঝগড়া করো না, কেননা তোমাদের নফস আসলে তোমাদের মালিকানাধীন নয়। (বরঞ্চ এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা।) তাহলে তোমাদের জন্য সমীচীন এটি হবে, নফসের মালিকের জন্যে এ ঝগড়া ছেড়ে দাও।

এতে যাবতীয় সে সব আলোচনা ও বির্তকের কথাগুলোও এসে গেছে যা স্বীয় সাহায্যার্থে করা হয়ে থাকে। এতে দ্বীনের স্বার্থে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয় নাই।

সময়ের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ঃ

বর্ণিত আছে যে, ফকীরদের নিজের অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তা থাকে না। বরং তাদের চিন্তা শুধু বর্তমানের অবস্থা নিয়ে যে , এ মহূর্তে আমাকে এ সময় কি করা উচিৎ ? আরো বর্ণিত আছে যে, অতীতের সময় নষ্ট হওয়ার চিন্তায় মনোনিবেশ করা পুনরায় আরেকটি সময় নষ্ট করারই নামান্তর। চিন্তা এই নিয়ে করা চাই যে, এ মুহূর্তে আমার করণীয় কি? আলোচ্য ভাবটুকু আমি একটি হিন্দী কবিতার ছন্দে ব্যক্ত করেছি।

گمامت حال کوماضی ومستقبل کی فکروں میں –

درستی حال هی کی هے تلافی عمر ماضی کی –

"অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তায় কেবল বর্তমানই বিনষ্ট হয়, বস্তুতঃ বর্তমানকে সুন্দর ও পরিমার্জিত করার মধ্যেই অতীত ভুলের সংশোধন নিহিত রয়েছে।"

দার্শনিক কবি রুমীর কবিতা ছন্দেও এ মর্মই ধ্বনিত হয়েছে।

ماضی ومستقبلت پرد ه خداست

তোমার অতীত ও ভব্যিতের বিষয়াবলী মহান আল্লাহর অদৃশ্য পর্দায় লুকানো রয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে তোমার অধিক চিন্তা অর্থহীন প্রয়াস মাত্র। (অনুবাদক) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অতীত ও ভবিষ্যতের নিষ্প্রয়োজনীয় চিন্তা । অন্যথায় প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে (যেমন তওবা ইত্যাদি) যদি তা হয়, তবে অন্য কথা।

বুযুর্গগানে দ্বীনের কল্যাণ ও প্রজ্ঞাময় স্নেহ এবং মার্জনা ঃ

বর্ণিত অছে যে, হযরত আবু আম্‌র ইবনে নুজায়দ (মৃত–৩৩৬ হিঃ) সুলুকের (আধ্যাত্মিক পথের) প্রথম যামানায় হযরত আবু উছমানের মজলিসে যাতায়াত করতেন। (গ্রন্থাকার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, আমার ধারণা মতে তিনি হচ্ছেন সে আবু উছমান, যিনি নুজায়দ ইবনে ইসমাঈল নামে সুবিদিত। যিনি ২৯৮ হিঃ সনে ইন্তিকাল করে ছিলেন।) হযরত আবু উছমানের পবিত্র বাণী সমূহ আমর্ ইবনে নুজায়দের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে ছিল। যদ্দরুন তিনি অলসতার পথ থেকে তওবা করে যিক্‌র ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যান। ঘটনাক্রমে একবার তার সামনে প্রতিবন্ধকতা আসে (অর্থাৎ তার হালাতে পরিবর্তন আসে, আটক হয়ে যান তিনি ভ্রান্তি চক্রে। অর্থাৎ অলস হয়ে পড়েন তিনি ইবাদত বন্দেগী থেকে)। তাই তিনি লজ্জায় হযরত উছমান থেকে গোপন থাকতেন এবং এদিক সেদিকে এড়িয়ে চলতেন। আর তাঁর মজলিসে যোগদান করা ছেড়ে দেন। একদিন আবু উছমানের সাথে পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাত ঘটে যায়। কিন্তু এপথ ছেড়ে তিনি অন্য পথ ধরেন। (দূরদর্শী শায়খ আবু উছমানের দয়া ও স্নেহশীলতা প্রণিধানযোগ্য যে,) তিনি তাঁর আপন পথটি ছেড়ে আবু আমুরের পেছনে ছুটলেন। আবু আমর আবার ভিন্ন পথ ধরলেন। আবু উছমানও ছুটলেন সে পথেই। এমনিভাবে তাঁর পেছনে তিনি লেগেই রইলেন। পরিশেষে তিনি আবু আমরকে ধরে ফেললেন এবং বললেন "প্রিয় বৎস! তুমি এমন ব্যক্তির সাহচার্য আদৌ গ্রহণ করো না, যে তোমাকে শুধু তোমার সুপথে থাকাকালীনই সময়েই মহব্বত করে। খুব লক্ষ্য করো যে, আবু উছমানের সাহচার্যের প্রকৃত উপকারিতা তো এমন অবস্থায়ই প্রকাশ

পাওয়ার উপযোগী। আবু আমর ইবনে নুজায়দের প্রতি এ হৃদ্যতা প্রদর্শনের ফলেই তাঁর নতুন করে তওবা করার সুযোগ ঘটে। পুনরায় তিনি আধ্যাত্মিকতার পথে ফিরে আসেন এবং যিকির ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন।

তাওবা শুদ্ধ হওয়ার আলামত ঃ

বুশায়খী (রঃ) (মৃত–৩৪৮হিঃ)-এর খিদমতে তাওবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল। জওয়াবে তিনি বললেন, যখন তোমাদের তওবাকৃত গুনাহটি স্মরণ হবে আর অন্তরে তার প্রতি আকর্ষণ না জন্মাবে,তখন হবে পরিশুদ্ধ তওবা। অর্থাৎ, স্বভাবতঃ গুনাহ্র কথা মনে করলে নফসের মধ্যে এক প্রকার তৃপ্তি অনুভূত ঃ হয়। সুতরাং তাওবার পূর্ণতা এবং গ্রহণের পর আল্লাহ্ পাকের চিরাচরিত নীতি এই যে, সে গুণাহ্র কথা মনে করলে তার তৃপ্তি আকর্ষণটুকুও আর অনুভূতঃ হয় না।

তাওবাকারীর দুনিয়ার প্রতি অনিহার কারণ, একটি সন্দেহের জবাব

হযরত আবু হাফ্‌স (মৃত -২৬০ হিজরীর কিছু পরে) তাঁকে -জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল যে, তাওবাকারী ব্যক্তি দুনিয়াকে ঘৃণিত ও অপছন্দ করার কারণ কি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ এর কারণ এই যে, দুনিয়া সেই স্থান যেখানে তার দ্বারা গুণাহ্ সংগঠিত হয়েছিল। এরপর জনৈক ব্যক্তি পুনরায় প্রশ্ন করলঃ দুনিয়া (যেমনি ঠিক গুহণাহ্র বহিঃপ্রকাশের বাস্তব ক্ষেত্র) তেমনি এটি আবার সে স্থানও যেখানে তার গুণাহ্ প্রকাশের নিশ্চয়তা বিরাজমান। পক্ষান্তরে তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চয়ত হীন কেবল সম্ভাব্য আশামাত্র।

ইয্‌যত ও অসন্মানের হাকীকাত ঃ

হযরত যুননূন মিসরী (রাহঃ) (মৃত–২৪৫ হিঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা কাউকে এর চেয়ে বড় সন্মান আর একটিও প্রদান করেননি যে, স্বীয়

নফসের হীনতা ও তাচ্ছিল্যের প্রতি তাকে অবহিত করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কারো অন্তরে স্বীয় নফসের প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব সৃষ্টি করে না দেয়াটা মূলতঃ সর্বাপেক্ষা অপমানকর ও অমর্যাদার বিষয়।

জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় না থাকা ঃ

ইমাম কুশায়রী (রঃ)-এর উস্তাদদের এক জন আবু আলী দাক্কাক (রাহঃ) ইমাম কুশায়রী (রাহঃ)-এর ওফাত হয় (৪৬৫ হিজরীতে) বলেছেন, লোকজনদের সাথে এমন কাপড় তুমি পরিধান কারো যা তারা সচারাচর পরিধান করে থাকে। আর এমন খাদ্য আহার কারো, যা তারা সাধারণত ঃ খেয়ে থাকে। হ্যাঁ বাতেনী কার্যকলাপে (আল্লাহ্ ভীতি ও তার মহব্বতে) লোকজন থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলো।

নির্জনতার প্রতি ভালবাসা আর নিঃসঙ্গ অবস্থায় আল্লার সাথে হৃদয়তার মধ্যে পার্থক্য

হযরত ইবনে মু'আয (রঃ) (মৃত–২৫৮ হিঃ) বলেন, তোমরা চিন্তা করো যে , তোমাদের আকর্ষণ কি নির্জনতার প্রতি ? নাকি নির্জনবাসে মহান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ? পার্থক্যের মাপকাঠি হচ্ছে, যদি তোমাদের আকর্ষণ বা হৃদ্যতা হয় শুধু নিঃসঙ্গতার প্রতি, তাহলে যখন নিঃসঙ্গ অবস্থা থেকে বের হয়ে আসবে তখন তোমাদের আকর্ষণও যেতে থাকবে। আর যদি নির্জন অবস্থায় তোমাদের আকর্ষণ থাকে কেবল আল্লাহ্র প্রতি তাহলে তোমাদের জ্যন্য দুনিয়ার লোকালয় আর বন জঙ্গল সবই সমান মনে হবে। এ দরজা হাসিল হয় সর্বশেষ পর্যায়ে। প্রাথমিক অবস্থায় এ আশাটুকু না করাই উত্তম।

কারো কারো জন্য নির্জনতা অপেক্ষা সামাজিকত-ই শ্রেয়ঃ

আবু ইয়াকুব সুসী (রঃ) (মৃত–৩৩০ হিজরী সনে, যিনি ইসহাক ইবনে মুহাম্মদের শাগরিদ)–বলেন, নির্জনতা অবলম্বন একমাত্র সে সকল

মনীষীগণের পক্ষেই কল্যাণকর যারা ইল্‌ম ও আমলের ক্ষেত্রে উচ্চতর মানে অধিষ্ঠিত। অমাদের ন্যায় দুর্বল চিত্তের লোকদের জন্য সামাজিকতা-ই শ্রেয়। এর দ্বারা একে অপরের আমল দেখে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সামাজিকতা, দ্বীনদার এবং মুসলিম ব্যক্তিবর্গ নিয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাকোয়ার সীমারেখা ঃ হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মুয়ায (রাহঃ) (মৃত–২৫৮ হিজরী) বলেন, কোন প্রকার ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণ ছাড়া ইলমের পরিসীমায় অবস্থান করার নামই 'তাকোয়া'। অর্থাৎ, যেটির বিষয়ে হালাল কিংবা হারাম এবং জায়েয কিংবা নাজায়েয হওয়ার ইলম হয়ে যাবে, সাথে সাথে সে অনুপাতে আমল শুরু করে দিবে। নাজায়েযকে জায়েয করার উদ্দেশ্য তাবীল বা বাহ্‌না তালাশ করার চিন্তায় পড়া উচিত নয়।

তাকোয়ার প্রেক্ষাপটে আমল করা আর না করার পরিণতি

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (রাহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তাকোয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াদির দিকে দৃষ্টিপাত করবে, সে কিন্তু আল্লাহ্ পাকের বড় বড় অবদানসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না। আরো বলা হয়েছে যে, যার লক্ষ্য দ্বীন সম্পর্কে গভীর হবে, কিয়ামতের দিন তদনুযায়ী তার সম্মান বেশী হবে। বস্তুতঃ এ ব্যাখ্যাই উত্তম ও যুক্তিযুক্ত। কেননা, দৃষ্টি সম্পন্ন যারা, তাদের ভয়ও বেশী। আর তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কঠোর ভাবে ।

যুহদ্ (দুনিয়ার প্রতি বিরাগমনা হওয়া)- এর হাকীকত ঃ

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ হযরত জুনায়দ (রাহঃ) (মৃত–২৯৭ হিঃ) পরিচিতি প্রদানের যার আদৌ প্রয়োজন নেই,) বলেন –যুহ্‌দের হাকীকত হচ্ছে যে, জিনিষ থেকে মানুষের হাত খালী, তা থেকে তার অন্তরটাও খালী হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, না পাওয়া বস্তুর জন্য অন্তরে পরিতাপ না আসা। –(অনুবাদক)

আসল ও বাস্তব নীরবতা ঃ হযরত আবু বকর ফারিসী (রঃ) কে (তাঁর মৃত সন আমাদের জানা নেই।) একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বাতেনী এবং বাস্তব চুপ থাকা কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন, "অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় নিমগ্ন না হওয়া। "আবু বকর ফারিসী (রাহঃ) আরো বলেন, মানুষ যাবত দ্বিনী অথবা দুনিয়াবী প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলতে থাকে, তাবত সে যেন নীরবই রইলো। গ্রন্থাকার হযরত থানবী (রঃ) বলেন এর দ্বারা একথা-ই প্রতীয়মান হয় যে, ফায়দা পৌঁছনোর নিমিত্ত যে সব মাশায়িখগণ কথা বলে থাকেন, তাদের সম্পর্কে আর প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। আবুবকর ফারিসী (রাহঃ)-এর এ বাণী উদ্দেশ্য, যাহিরী চুপের তুলনায় বাতিনী চুপের দিকে গুরুত্বারোপ করা।

খোদা-ভীতির প্রতিক্রিয়া

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (মৃত সন জানা নেই) (রাহঃ) বলেন, খোদা ভীতির অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, স্বীয় প্রবৃত্তিকে তোমরা আশা আর প্রলোভন বার্তা শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখবে না। অর্থাৎ, মন কে এমন প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করে রা না যে, হয়ত বা আল্লাহ্ তা'আলা অনুকম্পা প্রদর্শন করবেন নতুবা কেউ আসার জন্য সুপারিশ করবে অথবা অনতিবিলম্বে তওবা করে নেব। বরং প্রতিটি গুণাহ্ থেকে বেঁচে থাক, প্রতিটি অপরাধের পরপরই তাৎক্ষণিক তাওবা করে নাও। হযরত যুন্‌নুন মিসরী (রাহঃ) (মৃত –২৪৫হিঃ) এর খিদমতে জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল, বান্দাহার জন্য খোদা–ভীতির রাস্তা কখন সুগম হয়? উত্তরে তিনি বললেন, তখন, বান্দাহ যখন নিজেকে একজন পীড়াগ্রস্থ ভাবে আর ক্ষতিকর প্রতিটি জিনিষ থেকে বেঁচে থাকে এবং এ আশংকায় যে, হয়তো রোগ নিরাময়ে বিলম্ব ঘটতে পারে। হযরত আবু উছমান (মৃত সন অজানা) বলেন, খোদা–ভীতির নিদর্শন হচ্ছে, মানুষের পার্থিব বিষয়ে অধিক আশা পেষণ না করা। বস্তুতঃ খোদা ভীতির প্রভাবে অতি আশা নিজে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মওতের ভয়

বিশ্‌রে হাফী (রাহঃ) (মৃত ২২৭ হিঃ)-এর খিদমতে এক ব্যক্তি আবেদন কর, আমার মনে হয় আপনি মওতকে ভয় করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ভয় করি। কেননা আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়াটা আমি খুবই ভয়ানক মনে করি। গ্রন্থাকার হযরত থানবী (রঃ) বলেন, এতে এ কথাই বুঝা যায় যে, মওত মূলতঃ ভয়ের কিছু নয়। ভয় শুধু এ জন্য যে, এর মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে।

আশার উপর খোদভীতির প্রাধান্য দেয়া

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (ওফাত –২১৫হিঃ) বলেন, খোদাভীতির প্রাধান্য থাকাটাই অন্তরের জন্য অধিকতর উপযোগী। কেননা, আশা যখন প্রাধান্য পায়, তখন ক্বলব বা অন্তরাত্মা বিনষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, তাঁর এ বাণী অীধকাংশ লোকের বেলায় এবং অধিকাংশ সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নতুবা কখনো কখনো কারো বেলায় আবার আশার প্রাধান্যের মধ্যেই নিরাপত্তা সীমিত থাক। অর্থাৎ, অত্যধিক খোদা–ভীতির দরুন তাঁদের অন্তর এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, তা প্রায় নিষ্ক্রিয় হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়।

খোদাভীতি এবং আশা উভয়টির সমন্বয় সাধন করা

হযরত আবু উছমান মাগরিবী (ওফাত –৩৭২ হিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় নফসকে শুধু আশা দিতে থাকে, সে নিষ্ক্রয় হয়ে পড়ে। আবার যে সদা সর্বদা নফসকে শুধু ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে, সে নিরাশ হয়ে যায়। এ জন্য এমন করাটাই উত্তম কখনো আশা দেবে, আবার কখনো ভয় দেখাবে। (এটি দরজায়ে ইক্তিছাব অর্থাৎ, স্বাভাবিক অবস্থার জন্য, দরজায়ে হালে অর্থাৎ, অস্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন একটির প্রাধান্য দেয়াতেই মঙ্গল।)

চিন্তার উপকারিতা

চিন্তার ব্যাপারে তরীকতের মাশায়িখগণের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। সাধারণ আলিমগণের মতে দ্বীনের চিন্তা মানুষের জন্য উপকারী। কিন্তু দুনিয়ার চিন্তা প্রশংসনীয় এবং উপকারী নয়। অবশ্য হযরত উছমান হিয়ারী (রাহঃ) (মৃত–২৯০ হিঃ) –এর অভিমত –চিন্তা যে কোন ধরনেই হোক না কেন, ঈমানদারের জন্য তা ফযীলত এবং বহুবিধ সওয়াবের কারণ। অবশ্য এ চিন্তা কোন প্রকার পাপাচার বিষয় নষ্ট হওয়ার কারণেও হয়, তবুও উপকারী। কেননা জাগতিক চিন্তা যদিও আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের তেমন উপকরণ নয়,কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি কমপক্ষে গুনাহ্‌সমূহ হতে পরিত্রাণের উত্তম মাধ্যম তো বটেই, যা অন্যান্য মুছিবত ও দুঃখজনক বিষয়াদীর ব্যাপারে প্রযোজ্য।

চিন্তার কোন কোন বৈশিষ্ট্য

হযরত আবুল হুসায়ন ওয়াররাক বলেন, আমি আবু উছ্‌মান হিয়ারীর খিদমতে চিন্তা সম্বন্ধে আবেদন করলাম। (অর্থাৎ এ চিন্তা কি পরিমাণ হলে উপকারী হয়?) উত্তরে তিনি বললেন, চিন্তাশীল মানুষ যারা, তাদের চিন্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করার অবকাশ সাধারণতঃ হয়ে ওঠে না। প্রথমে চিন্তা হাসিল করার চেষ্টা কর। তারপর দরকার হলে এটি নিয়ে জিজ্ঞস করে নেবে। অর্থাৎ, তখন এ জিজ্ঞেস টুকুর সুযোগই হবে না।

ক্ষুধার আদব ঃ ইবনে সালিম (মৃত--) হতে দুইটি সূত্রের মাধ্যেমে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্ষুধা নিবৃত্ত করার আদব হচ্ছে, প্রতিদিনের খাওয়ার অভ্যাস হতে শুধু এতটুকু কম খাবে যা বিড়ালের কান সমতুল্য হয় –অর্থাৎ, খুবই কম। গ্রন্থার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, এ ব্যবস্থাপত্র তাদেরই বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে, যারা ক্লিষ্টদেহী কিংবা দুর্বল চিত্তের হয়। অন্যথায়–এ প্রসঙ্গে শক্তিশালীদের ব্যাপারে অন্য রকম উক্তিও বর্ণিত আছে।

তাওয়াযু বা নম্রতার যথোচিত পাত্র ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রাহঃ) (মৃত–১৮১ হিঃ) বলেন, ধনশালী দাম্ভিকদের সাথে

তাকাব্বরী ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করা চাই। অর্থাৎ, দাম্ভিকদের সাথে এ ব্যবহার করা উচিত। আর দরিদ্রদের সাথে নম্রতাসুলভ ব্যবহার করা উচিত। এগুলোর সবই তাওয়াযু বা নম্রতার শামিল।

তাওয়াযু এবং অন্যান্য আমলের বৈশিষ্ট্য

হযরত ইবরাহীম ইবনে শায়বান (মৃত---) বলেন, উচ্চতর মর্যাদা, নম্রতা ও বিনয়ী ভাবের অন্তরালে নিহিত । হাদীসে আছে–

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ –

অর্থাৎ "যে আল্লাহর ওয়াস্তে নম্রতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার মর্যাদা বুলন্দ করে থাকেন।"

অর্থাৎ, আল্লাহ পাক তাকে মর্যাদাশীল করে দেন। –আল হাদীস বস্তুতঃ তাকোয়ার মধ্যে ইজ্জত এবং অল্প তুষ্টির মধ্যেই মনের আযাদী নিহিত রয়েছে।

ওয়াসওয়াসা আসা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়

হযরত হারিছ মুহাসিবী (মৃত --) এর খিদমতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহর উপর যারা তাওয়াক্কুল করে, তাদের মধ্যে লোভ লালসা জন্মাতে পারে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ স্বভাগতভাবে লোভ-লালসার কিছু ওয়াসওয়াসা জন্মাতে পার বটে; কিন্তু তা তার জন্যে ক্ষতিকর নয়। আর লোভ-লালাসার আশংকা দূরীভূত ঃ করার উত্তম ও কার্যকর উপায় হল– "যা কিছু মানুষের হাত রয়েছে, তা থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া।"

ধৈর্যের সীমা

হযরত আবু দাক্কাক (মৃত --) বলেন, ধৈর্যের সীমা এই যে, তাক্‌দীর বিষয়ে প্রশ্ন না করা। হ্যাঁ মছীবতের কথা প্রকাশ করা যা শিকায়াত হিসেবে নয়, তা ছবর বা ধৈর্যের পরিপন্থীও নয়। দেখুন আল্লাহ তায়ালার হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ঘটনায় ইরশাদ করেন, 'আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি, তিনি ভালো বান্দাহ্ এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'য়ালা–ই আমাদেরকে এ সংবাদ

দিয়েছেন যে, আইয়ুব (আঃ) স্বীয় বিপদের কথা এভাবে প্রকাশ করেছেন আমাকে বিপদে পেয়েছে। আবু দা'ক্কাক (রাহঃ) আরো বলেছেন مسنى الضر কথাটি আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ভাষায় এজন্যই প্রকাশ করেছেন যে,। এ উম্মতের দুর্বলচিত্ত লোকদের যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হয় এবং অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের দরুণ সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয়।

রিয়ার সংজ্ঞা

আবু আলী দাক্কাক (মৃত--) বলেন, রিয়া (আল্লাহর হুকমে সন্তুষ্টি) -এর জন্য এইটি আবশ্যক নয় যে, বিপদ মছীবতের অনুভূতিই থাকবে না। রিয়া শুধু এই যে, প্রকাশ্য কিংবা গোপনে তাকদীর ও আল্লাহর চিরন্তন ফায়সালার উপর কোন আপত্তি উত্থাপন না করা।

রিযার পাত্র

ইমাম কুশায়রী (রাহঃ) বলেন, বান্দাহর উপর ওয়াজিব হল, সে সব জিনিষে রাযী থাকা, যে সবে রাযী থাকার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এখানে এমন কোন কথা নাই যে, আল্লাহ পাকের সমস্ত ফায়সালার উপরই বান্দাহ্কে রাযী হতে হবে। যেমন গুনাহ সমূহ এবং মুসলমানের দুঃখ দুর্দশা। আল্লাহ পাকের ফায়সালার সম্পৃক্ততা তো সেগুলো সাথে জড়িত। অথচ বান্দার জন্য ওগুলোতে রাযী থাকা জায়েয নয়। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, একথা সর্ব সাধারণকে বুঝানোর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। অন্যথায় বিশিষ্ট লোকদের জন্য আসল কথা তা–ই যা আরিফ রুমী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন। 'এ ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ গুনাহ্ এবং মুসলমানদের দুঃখ –দুর্দশা। বস্তুতঃ এগুলো ফায়সালার ফালাফল; মূল ফয়সালা নয়। এ জন্য এগুলোর উপর রিয়া বা সন্তুষ্ট থাকাও জায়েয নয়। দ্বিতীয়ত ঃ সে গুনাহ্ কিংবা মছীবতের সাথে আল্লাহর ফায়সালা যোগসূত্র। সুতরাং ইহার উপর রাযী বা সন্তুষ্ট থাকা ওয়াজিব। এর দ্বারা একথাই সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কাযা এবং মাক্‌যী দু'টি পৃথক পৃথক জিনিস। আর এ দু'টির হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন ।

রিযার উপযুক্ত সময়

হযরত আবু উছমান (মৃত–২৯৮ হিজরী) – এর খিদমতে জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল যে, আঁ, হযরত (সাঃ)-এর এ ইরশাদের অর্থ কি? " আমি আপনার কাছে কাযার পর রাযী থাকা কামনা করছি"। আবু উছমান (রাহঃ) জওয়াবে বললেন, হাদীসে "কাযার পরে" কথাটি সংযুক্তি করণের কারণ হচ্ছে, ফায়সালার পূর্বে তো রিযার শুধু ইচ্ছা হতে পারে সরাসরি রিযার অস্তিত্ব তখন বিদ্যমান থাকে না। মূলত ঃ কাযা বা ফায়সালার পর সন্তুষ্ট থাকাই হল রিযার আসল মর্মকথা।

স্বীয় নাফস এবং অন্যান্য লোকজনদের সাথে আচরণগত পার্থক্য

হযরত 'আমর ইবনে উছমান মাক্কী (রাহঃ) (ওফাত ২৯১ হিজরী) ইমাম মুযানী (মৃত--) (রাহঃ) -এর সম্পর্কে বলেন, আমি ইমাম মুযানী (রাহঃ) অপেক্ষা স্বীয় নফসের সম্পর্কে অধিকত কঠোর আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের সাথে তার চইতে অধিকতর নরম ও বিনম্র আচরণধর্মী অপর কাউকে দেখা যায় নাই।

বান্দার বন্দেগী সম্পর্কিত বিষয়

হযরত আবু আলী জাওযেজানী (রঃ) -এর ভাষ্য, রিযা হচ্ছে উবুদীয়াত বা বন্দেগীর বাড়ী সমতুল্য। ধৈয্য হচ্ছে তার দরওয়াযাহ। বাড়ীতে পৌঁছার পর সাধারণতঃ নিরাপত্তা আসে, আর কামরায় প্রবেশ করার পর আসে মানসিক শান্তি ।

উপরোক্ত ভাষ্যের তাৎপর্য হচ্ছে এই, সাধারণত ঃ বাড়ীর তিনটি দরওয়াযাহ হয়ে থাকে। প্রথম দরওয়াযাহ, তারপর বাড়ীর আঙ্গিনার দরওয়াযাহ, আর এটি যেন বাড়ীর মাধ্যমিক দরওয়াযাহ, তারপর ঘরের অন্দর মহলে দরওয়াযা। যেটিতে মানুষ শান্তি পেয়ে থাকে। আর এটি যেন বাড়ীর শেষ দরওয়াযাহ। অনুরূপ আবদীয়াত তথা বান্দাহর বন্দেগীর তিনটি দরওয়াযাহ বা সোপান হয়ে থাকে। প্রথম ছবর বা ধৈর্য । যখন কোন প্রকার জাগতিক দুর্ঘটনা পেশ হয়, আল্লাহ তায়ালা প্রথমতঃ ছবর দান করেন। তারপর " রিযা বিল-কাযা " বা আল্লাহর ফয়সালাতে সন্তুষ্টি। যা স্বস্তি লাভের উপযুক্ত মাধ্যম। তারপর তাফ্‌বীয বা আত্মসমর্পণ এটির মাধ্যমে সার্বিক বিন্যাস এবং এর ফলাফল প্রকাশ পেলো।

মুরীদ এবং মুরাদের হুকুমাবলী

'রিসালায়ে কুশায়রীয়া এর ইরাদা' অনুচ্ছেদে মুরীদ এবং মুরাদের নিয়মাবলী বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, অবশিষ্ট রইল মুরীদ এবং মুরাদের পার্থক্য। এ পর্যায়ে প্রথমত ঃ কথা হল, প্রতিটি মুরীদ মুরাদও হয়ে থাকে। কেননা সে যদি আল্লাহর মুরাদ তথা ইচ্ছার পাত্রই হত, অর্থাৎ আল্লাহ তার অবস্থার উপর তাওয়াজ্জুহ ও সাহায্য না দিতেন, তবে সে মুরীদই হতে সক্ষম হত না। কারণ বিশ্বে কোন কাজই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরকে সংঘটিত হতে পারে না। অনুরূপ প্রতিটি মুরাদ আবার মুরীদ তথা ইচ্ছাকারীও হয়। কেননা যখন আল্লাহ তায়ালা তাকে মুরাদ ভেবে নেন, তখন তাকে এ তাওফীকও দিয়ে থাকেন। সে যেন মুরীদ হয়ে যায় । কিন্তু সুফীয়ায়ে কিয়ামের পরিভাষায় মুরীদ এবং মুরাদের মাঝখানে তফাত রয়েছে যথেষ্ট। তাঁদের মতানুসারে যাঁরা সুলুক বা তরীকাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সদস্য তাদেরকে বলা হয় মুরীদ, আর যাঁরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাদেরকে আখ্যা দেয়া হয় মুরাদ। **দ্বিতীয়তঃ** মুরীদ হচ্ছেন তাঁরা, মুজাজাদা এবং রিয়াযাতের কষ্টকর সাধনায় যাঁরা রয়েছেন। পক্ষান্তরে মুরাদ হচ্ছেন সে সকল সাধক পুরুষ যারা কষ্ট ছাড়াই যারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। সুতরাং মুরীদকে সইতে হবে বহুবিধ যন্ত্রণা।

অনেককে প্রথমত ঃ মুজাহাদার তাওফীক দেয়া হয়, তারপর বিভিন্ন মুখী যন্ত্রণা সহ্য করার পর তাকে টেনে নেয়া হয় স্বীয় উদ্দেশ্য। আবার অনেকের অন্তরে প্রথমেই গভীর ভাব কাশফ হতে থাকে। পরে তিনি ঐ স্তরে গিয়ে সফল কাম হয়ে যান, যেখানে অন্যারা মুজাহাদার দ্বারাও পৌঁছার সুযোগ পান না। এদের অনেকেই পথ সুগম পাওয়া সত্ত্বেও দুর্গম সাধনা

আত্মনিয়োগ করেন। উদ্দেশ্যে মর্যাদা লাভ করা মুজাহাদা না করার দরুন যা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

যিকির শুধু মুখে মুখে হলেও নেয়ামত

হযরত আবু উছমান (সম্ভবতঃ আবু উছমান হিয়ারী মৃত ২৯৮হিঃ)-এর খেদমতে আরজ করা হয়েছিল,আমরা তো মুখে আল্লাহর যিকির করে থাকি কিন্তু অন্তরে তার কোন স্বাদ অনুভব করি না। জবাবে তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর শোকর আদায় কর যে, তিনি তোমাদের অঙ্গরাশি হতে একটি অর্থাৎ মুখকে স্বীয় তাবেদারী ও ইবাদতের দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

কোন কোন সময় বান্দাহর উপর আল্লাহর রহমত এভাবে হয় যে তাকে আল্লাহর যিকিরে বাধ্য করা হয়

সুফীয়ায়ে কিরামদের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, লোকজন আমার কাছে বর্ণনা করল, অমুক বনে আল্লাহর এক বান্দাহ যিকির ও ইবাদতে নিমগ্ন আছেন, আকস্মিক একটি হিংস্রজন্তু তাঁর সামনে এসে পড়লো এবং তাঁর গায়ে প্রচণ্ড আঘাত করে বসল। যদ্দরুন তার গায়ের থেকে এক টুক্‌রা গোস্ত ছুটে পড়ে যায়। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ এমনটি কেন? জাওয়াবে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা এ হিংস্র জন্তুটিকে আমার উপর নিয়োগ করে রেখেছেন। যখনই আল্লাহর যিকিরে আমার কিঞ্চিত ত্রুটি হয়ে যায়, তখনই সে আমাকে এমনভাবে আঘাত করে যা তুমি নিজেই প্রত্যক্ষ করলে।

'ফতুত ' অর্থাৎ উদারমনা হওয়ার বর্ণনা

হযরত হারিছা মুহাসিবী (রহঃ) বলেন, ফতুত অর্থাৎ উদারমনা হওয়ার পরিচয় এই যে, তুমি মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক আচরণ করবে কিন্তু নিজের জন্য কারো থেকে ইনসাফ বা ন্যায়ের প্রত্যাশায় থাকবে না।

'ফতুতের কোন কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের বর্ণনা

বর্ণিত আছে যে, উদার চিত্তের প্রশস্ত মনাদের একটি জামায়াত এমন এক ব্যক্তির যিয়ারতে গিয়ে ছিলেন যিনি উদারতায় বিখ্যাত ছিলেন। এ উদার ব্যক্তিটি তাঁর গোলামকে নির্দেশ দিলেন, দস্তরখান নিয়ে আস। তিনি একাধিক বার বলা সত্ত্বেও গোলাম দস্তরখান আনতে বেশ বিলম্ব করল। জমায়াতের লোকজন পরস্পরের মুখ চেয়ে বলতে থাকেন এ কাজটি তো প্রশস্তমনার পরিপন্থী ঠেকছে যে, এর ন্যায় এমন লোককে খাদেম নিযুক্ত করা যে, তাঁর ন্যায় এমন মহান ব্যক্তি কর্তৃক এতবার বলার পর যে দস্তারখানটি নিয়ে এলো না। কেননা, এর মত গোলম দ্বারা অনেক সময় এমন এমন মহৎ লোকেরাও কষ্ট পাবেন, যাদেরকে একটু আরাম ও শান্তি পৌছানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এক ব্যক্তি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, দস্তরখান নিয়ে আসতে তোমার এত বিলম্ব হল কেন? প্রতি উত্তরে গোলাম বললো, দস্তরখানে একটি পিপিলিকা ছিল। পিপিলিকাসহ দস্তরখানাটি আনা আদবের খেলাফ মনে করলাম। আর একথা ফতুত তথা উদারতার পরিপন্থী মনে করলাম যে, পিপিলিকাটিকে দস্তরখান থেকে বাইরে নিক্ষেপ করে দেই । তাই আমি দাঁড়িয়ে থাকি। পিপিলিকা অনায়াসেই দস্তারখান থেকে চলে গেল। আগন্তুক লোকজন বলতে লাগলো, হে গোলাম! তুমিতো নিতান্তই পুংখানুপুংখ উদারতার কাজটুকু আদায় করেছো। উদারমনাদের খিদমতের জন্য তোমার মত মানুষই দরকার।

ফিরাসাত তথা সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তার সীমা

হযরত আবু হাফস নিশাপুরী (রাহঃ) (মৃত ২৭০ হিজ্‌রী) বলেন কারো এ অধিকার নেই যে, সে ফিরাসাতের দাবী করবে। অন্যের ফিরাসাতকে ভয় করা উচিত। কেননা, নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "ঈমানদারের ফিরাসাতকে তোমরা ভয় কর।" একথা ইরশাদ করেননি যে, ফিরাসাত দিয়ে তোমরা কাজ নাও। যে ব্যক্তি ফিরাসাতকে

ভয় করার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে আবার ফিরাসাতের দাবী করা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে ?

হুসনে খুলূক তথা সদ্ব্যবহারের সার কথা

হযরত ওয়াসিতী (মৃত -৩২০ হিঃ) বলেন "খুলুকে আজীম' তথা উন্নত চরিত্রের নিদর্শন হচ্ছে, সে কারো সাথেই ঝগড়ারত হবে না। যার কারণ হল- আল্লাহ্ পাকের মারিফাতের শেষ প্রান্তে অধিষ্ঠিত থাকা। মারিফাতের এ জ্ঞানটুকু আয়ত্ব করার ফলে তার ঝগড়া বিবাদের সুযোগই হবে না।

হুসনে খুলুক বা সদ্ব্যবহার অর্জনের নিয়ম

হযরত ওয়াহাব (মৃত ১১০ হিজরী) বলেন, যে চল্লিশ দিন কোন অভ্যাসকে অনুশীলন করবে আল্লাহ্ তায়ালা সে অভ্যাস কে তার স্বভাব চরিত্রের অঙ্গীভূতঃ করে দিবেন।

উচ্চস্তরের বদান্যতা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (মৃত ১৮১ হিজরী) বলেন, যে জিনিস অন্য মানুষের হাতে রয়েছে, তা থেকে স্বাধীন থাকা উত্তম। সে বদান্যতা থেকে, যা নিজের উপস্থিত জিনিষকে খরচ করে দেয়ার মাধ্যমে হয়। অর্থাৎ মানুষের বস্তু হতে লোভ দৃষ্টি ছিন্ন করা চাই। অন্যের মালিকানার আওতায় রয়েছে এমন বস্তুর লিপ্সা না করাও এক প্রকার বদন্যতা ছাখাওয়াত। আর নিজের সম্পদ খরচ করার চেয়ে বড় ছাখাওয়াত বা দানশীলতা সেইটি।

আত্মমর্যাদার রহস্য

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (রাহঃ) বলেন, কোন কাজে অন্যের অংশীদারিত্বকে অপছন্দনীয় মনে করার নামই গায়রাত বা আত্মমর্যাদা বোধ। আর এটি হচ্ছে সাধারণ অর্থের গায়রাত। এ গায়রাতের সম্বন্ধ যখন

আল্লাহ্ পাকের সাথে করা হবে, তখন এর অর্থ হবে আল্লাহ্ পাক তাঁর সত্বার সাথে অন্যের অংশীদারিত্বকে পছন্দ করেন না। যেটি নিরংকুশ তাঁরই হক। অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য। আর গায়রাতের সাথে যখন বান্দাহর সম্বন্ধ বা সম্পৃক্ততা হয়, তখন তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম প্রাকার হচ্ছে বস্তুর ব্যপারে আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করা। এ প্রকারটি বান্দাহর পক্ষ হতে আল্লাহর ব্যপারে হতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে, বান্দার কাছে এটুকু চাওয়া যে, সে তার স্বীয় বন্দেগীতে সর্ব অবস্থায় এবং সর্ব সময় একটি নিশ্বাসও আল্লাহ্ তায়ালাকে ব্যতীত আর কারো জন্য ব্যয় না করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অংশীদার কথাটির অর্থ হবে গায়রুল্লাহকে স্বীয় হালত ও কাজ-কারবারে অংশ নিতে না দেয়া। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গায়ারাতের এ দিকটি প্রশংসনীয়। কেননা, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে কোন মুহূর্তে। শরীক করা নিন্দনীয়।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে– 'গাযরাতে আবদ ' বান্দাহ্ সম্পর্কীয় গায়রাত। অর্থাৎ কোন জিনিসের উপর গায়রাত করা। এটি বান্দাহর পক্ষ হতে আল্লাহর তায়ালার শানে না হতে হবে। এর উদাহরণ হচ্ছে, বান্দাহ্ কর্তৃক কার্পণ্য ও গায়রাত করা–আল্লাহ্ তায়ালা অমুক ব্যক্তির উপর মেহেরবান হচ্ছেন কেন? তখন মুশরিক কিংবা অংশীদারী কথাটির অর্থ হবে আল্লাহর দয়া ও নৈকট্যে অন্য কারো অংশীদারীত্ব হওয়া।

গায়রাতের এ দ্বিতীয় প্রকার নিছক মুর্খতা। কারণ এমতাবস্থায় এর অর্থ হল– আল্লাহ্ তা'আলাকে একমাত্র নির্ভর মনে করা তাকে ছাড়া আর কেউ না জানা এবং না চেনা। আর সে ছাড়া আল্লাহর যিকির অপর কেউ না করুক। কোন কোন আল্লাহ্ ওয়ালাদের থেকে যদিও এ দ্বিতীয় প্রকার বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু তা ঘটেছে আত্মভোলা ও স্বত্ত্বহারা অবস্থায়। যেমন নাকি আল্লামা শিবলী (রাহঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল, আপনার কোন সময় মানসিক শান্তি অনুভূতঃ হয়। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তৃপ্তি বোধ

করব সে সময়টিতে যখন দেখব আমাকে ছাড়া আল্লাহকে আর কেউ স্মরণ করছে না। উপরের বর্ণনা রেসালায়ে কুশায়রী হতে চয়নকৃত।

ইসতিকামাতের বর্ণনা

হযরত শিবলী (রাহঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন ইস্তিকামাত অর্থ হচ্ছে বর্তমান সময়েকে কিয়ামাত মনে করা। এমনটি জ্ঞান করলে সব অবস্থায় সব আমলে ইসতিকামাত পয়দা হয়ে যায়।

ইখলাস ও সততার বর্ণনা

আমি উস্তাদ আবু আলী দাক্কাককে একথা বর্ণনা করতে শুনেছি, ইখলাস বা একনিষ্ঠতা হচ্ছে আমল করার সময় সৃষ্টির উপর দৃষ্টি দেয়া থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ সৃষ্টির কারণে আমল করাও চাই না এবং পরিত্যাগ করাও চাই না। যা কিছু করবে খোদারই উদ্দেশ্য নিয়ে করবে আর সিদ্‌ক বা নিষ্ঠার অর্থ প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত থাকা অর্থাৎ স্বীয় কাজ -কারবার , আচার-আচরণে খাহেশ ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে বেঁচে থাকা। অতএব, একনিষ্ঠ বান্দাহ যারা তাদের মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানো ভাব আসতে পারে না। আর সাদিক বা নিষ্ঠাবানদের অন্তরে অহংকার ও আমিত্বের গন্ধ থাকতে পারে না। হযরত যুন্নুন মিসরী (মৃত– ২৪৫ হিজরী রাহঃ) বলেন, 'ইখলাছ' এ পূর্ণতার পুর্বশর্ত হচ্ছে, স্বীয় ইখলাসে সত্যবাদী হওয়া এবং এতে সুদৃঢ় থাকা। অনুরূপ সিদক বা সত্যতার পরিপূর্ণতার পূর্বশর্ত হচ্ছে, স্বীয় নিষ্ঠা ও সততায় একনিষ্ঠ ও মুখলিস হয়ে অটল থাকা। হযরত ইয়াকুব মুসী যিনি ছিলেন হযরত যুনায়দ বুগদাদী (রাহঃ)-এর সমসাময়িক–তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, যখন কেউ স্বীয় ইখলাসকে প্রত্যক্ষ করতে থাকবে, অর্থাৎ নিজে যে মুসলিম একথা যখন নিজের নজরে ধরা পড়ে যাবে, তখন তার ইখলাসকেই বিশুদ্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, একথার আসল অর্থ হচ্ছে তার নিজের দৃষ্টিতে নিজেকে মুখলিস জ্ঞান করা মূলতঃ ইখলাসের ক্ষেত্রে সে মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ। আবু আলী (রাহঃ) থেকে পূর্বে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে সিদক

ছাড়া ইখলাস পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যুন্নুন মিসরী (রাহঃ) -এর উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা একথাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং আপন ইখলাসে দৃষ্টি পড়ার অর্থই হবে স্বীয় ইখলাসের অপূর্ণাঙ্গতা। তাই এ ধরণের ইখলাসে পুনঃ ইখলাস সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। হযরত ফুযায়ল ইবনে আয়ায (রাহঃ) (মৃত –১৮৭ হিঃ) বলেন, মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেয়া রিয়া বা লোক দেখানো। আবার মানুষের কারণে কোন আমল করাটা শিরকের অন্তর্ভূক্ত। ইখলাস হল– আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ভয় আপদ থেকে মুক্ত রাখুন।

হায়া বা লজ্জার হাকীকাত

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) (মৃত– ২৪৫ হিজরী) বলেন, লজ্জার হাকীকাত হচ্ছে – অন্তরে ভয় এবং সাথে নিজের অতীত গুনাহ্‌র প্রতি অনুতাপ, অনুশোচনা ও ঘৃণার ভাব জাগরুক থাকা।

হায়ার প্রভাব

হযরত যুন্‌নূন মিসরী (রাহঃ) আরো বলেছেন, 'মহব্বত' -এর বৈশিষ্ট্য হল সে প্রেমিককে কথক বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ, যখন তার তীব্রতা শুরু হয়, তখন বাকশক্তি বাঁধ মানে না। আর লজ্জা মানুষকে নির্বাক করে দেয়। একই ভাবে ভয় ভীতি ব্যক্তিকে অস্থির ও অধীর করে দেয়।

অপর শিরোণামে লজ্জার হাকীকাত

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (রাহঃ) বলেন হায়া বা লজ্জাবোধ অন্তরকে বিগলিত করে দেয়। তিনি আরো বলেন, মানুষের অন্তরাত্মা স্বীয় গুনাহর দরুন মাওলার অবগতির ভয়ে বিগলিত হওয়ার নামই হচ্ছে হায়া বা লজ্জাবোধ। কোন কোন বুযুর্গের মতে আল্লাহ্ তা'লার মহানত্ব ও ভয়ে অন্তর সংকুচিত হওয়ার নাম হায়া।

লজ্জার উৎস ও কারণ

হযরত জুনায়দ বাগদাদীকে (রঃ) হায়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জওয়াবে তিনি বললেন, যখন মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার নেয়মাত সমুহকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে আর সেই সাথে অপন গুনাহ্ ও অপরাধগুলো অন্তর দৃষ্টিতে উপস্থিত থাকে তখন এ দু'য়ের সংমিশ্রণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়– তারই নাম হায়া।

স্বাধীনতার বিবরণ

উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক (রাহঃ) বলেন, তোমরা উত্তমরূপে বুঝে রাখ যে, চরম গোলামী বা আনুগত্যের অন্তরালে প্রকৃত আযাদী নিহিত রয়েছে। সুতরাং মানুষের দাসত্ব আল্লাহর জন্য যখন নিরংকুশ হয়ে যায়, তখন অপরের দাসত্ব থেকে তার স্বাধীনতা বা আযাদী নির্ভেজাল হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আযাদী সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, বান্দাহ্ কোন কোন সময় এমন এক স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়, যখন দাসত্বের শৃঙ্খলতার সাথে জড়িত থাকে না এবং আদেশ, নিষেধ এবং শরীয়তের গন্ডিরেখা থেকে সম্পুর্ণ আযাদ হয়ে যায়, অথচ তার জ্ঞান ও অনুভূতি বহাল থাকে। এমতাবস্থায় তার এহেন ধারণা দ্বীন ইসামের সীমারেখা থেকে বের হওয়ারই নামান্তর। সুফীয়ায়ে কিরাম যে হুররিয়্যাত বা স্বাধীনতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেটি হল, বান্দাহ্ কোন সৃষ্ট বস্তুর শৃংখল হতে মুক্ত হওয়া। অধিকন্ত সব কিছু থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা। পার্থিব প্রয়োজন, কোন বস্তু- সমাগ্রীর কামনা–বাসনা, ইহলৌকিক কিংবা পরলৌকিক বিষয় বস্তু ইত্যাদির কোন আকর্ষণই তাকে অনুগত বান্দা বানিয়ে নিতে সক্ষম না হওয়া।

যিকির -এর বর্ণনা ঃ

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালাকে স্বীয় অন্তঃকরণে স্মরণকরা মুরীদদের জন্য তরবারী বিশেষ যদ্বারা সে শত্রুর মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়। উপরন্ত এর সাহায্যে নিজের উপর আপতিত বিপদ –বিপর্যয় প্রতিহত

করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। বস্তুতঃ কোন মছিবত নিকটবর্তী হলে আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ-আত্মনিযোগের ফলে তার দিকে অগ্রসরমান সে বিপদ দূরীভূতঃ হয়ে যায়।

বিলায়াতের কিছু বৈশিষ্ট্য

হযরত ইয়াহ্য়া ইবনে মুয়ায (১) বলেন, ওয়ালী যারা হন, তাঁদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য থাকবে। তাঁদের মধ্যে থাকেনা রিয়া বা লোক দেখানো মনোবৃত্তি; **দ্বিতীয়ত ঃ** মুনাফেকী তাঁরা কখনো করেন না। আর যাঁদের বৈশিষ্ট্য হবে এমন, তাঁদের বন্ধুর সংখ্যা হবে নিতান্তই নগন্য।

ওয়ালিদের শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার কারণ

হযরত আবু তুরাব নাখশাবীর ভাষ্য – আল্লাহর থেকে যখন কলব বিচ্যুত হওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়, তখন এর সাথে সাথে তার মধ্যে আল্লাহ্ওয়ালাদের নিন্দা চর্চা এবং শত্রুতা করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়।

দোয়ার বর্ণনা

তরীকতের বুযুর্গদের মধ্যে মতবেদ রয়েছে যে, দোয়া করাটাই উত্তম, না নীরবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থকাটা উত্তম। আল্লামা কুশায়রী (রাহঃ) এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, বান্দাহর জন্য একান্ত কর্তব্য, মুখে মুখে তো দোয়া প্রার্থী হওয়া, কিন্তু

*(১) **টীকাঃ** গ্রন্থকার হযরত থানবী (রাহঃ) সেব সুফীয়ায়ে কিরামের অবস্থা ও বাণী এ কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাথে তিনি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মৃত্যু সনও উল্লেখ করে দিয়েছেন। তাহলে পাঠক সমাজ জানতে পারবে, এসব বাণী ও অবস্থা ইসলামে পূর্বসুরী এবং উম্মতের ইমামদের। এর দ্বারা পাঠকদের মনে জন্মাবে গভীর আস্থা। কিন্তু একটি নাম যেহেতু একাধিকবার আসছে, এজন্য প্রত্যকরই মৃত্যু সন উল্লেখ করাটা অতিরিক্ত মনে হচ্ছে। আবার পুর্বের দিকে হাওয়ালা করাটাও কষ্টকর বলে মনে হয়। এজন্য কিতাবের পরিশেষ্টে যেসব বুযুর্গানদের মৃত্যু সন একত্রে লিখে দেয়া হয়েছে যেন উভয় প্রকার ফায়দা হাসিল হয়। –মুহাম্মাদ শফী (রাহঃ)*

অন্তরে অন্তরে আল্লাহর বিধানে খুশী থাকা। তাহালে দোয়া এবং সন্তুষ্টি উভয়টির ভাগীদারই হতে পারবে। গ্রন্থকার বলেন, মুখে দোয় প্রার্থী হওয়ার অর্থ মুখ এবং অন্তর দ্বারা দোয় করা। এর অর্থ একথা নয়,-একমাত্র মুখেই দোয় করবে আর কলব তা থেকে গাফিল থাকবে। কেননা গাফিল মন নিয়ে দোয়া করার প্রতি হাদীসে নিন্দা বাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

দোয়া কবুলে বিলম্বের রহস্য

কথিত আছে ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ কাতান (রাহঃ) স্বপ্নে আল্লাহর দর্শন লাভ করে ছিলেন। তিনি তখন আল্লাহ পাকের কাছে আরয করে ছিলেন, হে আল্লাহ! আপনার খিদমতে বহু দোয়া করে থাকি। কিন্তু আপনি কবুল করছেন না। আল্লাহ পাক বাললেন, আয় ইয়াহইয়া! আমি তোমার দোয়ার আওয়ায শুনতে আগ্রহী, এজন্য কবুল করতে বিলম্ব করছি যেন এ আওয়াযের ধারাবাহকিতা অব্যাহত থাকে।

ফকীরীর হক

হযরত জুনায়দ (রাহঃ) বলেছেন,হে অল্লাহওয়ালা ফকীরদের জামায়াত! তোমাদেরকে মানুষে চিনে অল্লাহর নামের উপর। আর তোমাদের সম্মান প্রদর্শন করে এ জন্যই। তাহলে তোমরাও এটুকু লক্ষ্য রাখবে, যখন তোমরা নির্জনে আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকবে, তখন তাঁর সাথে তোমাদের কি ধরণের আচরণ হওয়া উচিত।

ফকীরীর বৈশিষ্ট্য

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রাহঃ) বলেছেনঃ আমরা ফকীরী কামনা করেছি। কিন্তু স্বচ্ছলতা নিজে নিজেই আমাদের হাতে ধরা দিয়েছে। পক্ষান্তরে মানুষ কামনা করে সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু পেয়েছে তারা দারিদ্র্য আর অনটন।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (রাহঃ) –এর সামনে লোকজন একদা ফকীরী এবং স্বচ্ছলতা সম্পর্কে আলোচনা উঠালে তিনি বললেন, বন্ধুগণ!

কাল কিয়ামতের দিন স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ওযন হবে না, এবং ওযন হবে না, ফকীরীরও আসলে ওযন হবে ছবর এবং শোকরের। অর্থাৎ, ধনশালী স্বাবলম্বী যদি তার ধনের শোকর আদায় না করে এবং ফকীর যদি করে ছবর, তখন এ উভয়টি প্রশংসার যোগ্য। অন্যথায় শোকর আদায় না করার দরুন ধনশালীর ধন যেমনি নিন্দিত, আবার ছবর না করার দরুন দারিদ্রের দারিদ্র বা ফকীরীও তেমনি লাভজনক কিছু নয়। অতএব, ফকীরীর শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে ধৈর্য ও ছবরের অন্তরালে।

তাছাওউফ কি ?

হযরত উমার ইবনে উসমান মাক্কীর নিকট আরয করা হয়ে ছিল যে, তাসাওউফের হাকীকাত কি ? জাওয়াবে তিনি বললেন, এর হাকীকাত হচ্ছে বান্দাহ সব সময় এমন একটি অবস্থায় থাকবে, যা সে সময়ের জন্য উপযোগী হয়। শায়খ আবু হাসান সিরাওয়ানী (রাহঃ) –এর উক্তিটিও এমনই। তিনি বলেছেন, সুফী তিনিই, যিনি কেবল তাসবীহ তাহলীল ও ওযীফার চটায় লিপ্ত নহেন, বরং সময় সুযোগ এবং পরিস্থিতির চাহিদা অনুপাতে কাজ করে থাকেন।

যাহিরী ও বাতিনী আদবের সমন্বয়

হযরত হাফ্স (রাহঃ) বাগদাদে তাশরীফ আনলে হযরত জুনায়দ (রাহঃ) তাঁকে বললেন, আপনি আপনার মুরীদদেরকে বাদশাহদের ন্যায় আদাবের তালীম দেয়ার কারণ কি? হযরত হাফস্ বললেন, যাহিরী আদাব ও শালীনতা বাতিনী আদাব ও শালীনতারই পরিচায়ক। হযরত শিবলী (রাহঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন নিবেদন করার সময় সংকোচহীন কথা বলা আদাবের পরিপন্থী।

মহব্বতের দাবী আদাব না সংকোচহীনতা? এ দু'য়ের সমন্বয়

হযরত জুনায়দ (রাহঃ) বলেন, মহব্বত যখন পরিপূর্ণ হয়, আদবের শর্তগুলো তখন পরিলুপ্ত হয়ে যায়। হযরত আবু উছমান বলেন, মহব্বত

পরিপূর্ণ হয় যখন, তখন মহব্বতকারীর দায়িত্বে আদবের প্রতি গুরুত্বরোপ অধিকতর তীব্র হয়ে যায়। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, প্রথমোক্ত কথা আদব বর্জন। মহব্বতের ফল তখনই হতে পারে মহব্বত যখন মারিফাতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। আর দ্বিতীয় কথাটি অর্থাৎ, আদবের গুরত্ব তখনই, মারিফাত যখন মহব্বতের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। দুই অবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আরো একাধিক বাণী রয়েছে আমি যা লিখেছি। তা আমার রুচি সম্মত।

ছফরের কিছু হুকুম এবং আদবের বর্ণনা

হযরত উস্তাদ আলী খাওয়াস (রাহঃ) বলেন, এ বিষয়ে সূফী সম্প্রদায়ের দ্বি-মত রয়েছে। কারো মতে ছফর অপেক্ষা স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করা উত্তম। এমন কি তাঁর সমস্ত জীবনে হজ্জ ব্যতীত কোন সময় ছফর করেন নাই। অধিকাংশ জীবনটাই তাঁদের নিজের আবাসস্থলেই কেটেছে। এক্ষেত্রে হযরত জুনায়দ (রাহঃ), হযরত সাহ্ল ইবনে আবদুল্লা (রাহঃ) আর আবু ই'য়াযীদ বুস্তানী (রাহঃ) এবং আবু হাফ্স (রাহঃ) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আর কারো কারো মতে আবাসভূমিতে অবস্থান অপেক্ষা ছফর করা শ্রেয়। এই জন্যে তাদের অধিকংশের সারা জীবন ভ্রমণ বা ছফরে অতিবাহিত হয়েছে। এমনকি তারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন ছফরের অবস্থাতেই। এঁদের মধ্যে উদহরণ স্বরূপ আবু আবদুল্লাহ মাগরিবী এবং ইব্রাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ)-এ নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর দিকে, অনেক মাশায়িখ জীবনের প্রথম ভাগ ছফরে কাটিয়ে শেষাংশে গিয়ে ছফর স্থগিত করে এক জায়গায় স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। যেমন, হযরত আবু উসমান হিয়ারী এবং শিবলী গং (রহঃ) তাঁদের প্রত্যকেরই ভিন্ন ভিন্ন কিছু নীতিমালা রয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে স্বীয় তরীকা নির্ধারণ করে গেছেন।

মূল প্রণেতা হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন, তাসাওউফের মূল কথাই হচ্ছে মানসিক স্থীরতা। (অর্থাৎ মনের ধারণা ও চিন্তা এক কেন্দ্রে একত্রিত করে রাখা। এবং যে সব জিনিস অস্থীর করে তোলে কলবকে, সে সব

থেকে পূতঃ-পবিত্র রাখা। মনের অস্থিরতা কারো অর্জিত হয়েছে ছফর করার মাধ্যমে, আর কারো হয়েছে ছফর স্থগিত করার মাধ্যমে। তাই যাঁর অর্জিত হয়েছে ছফর না করার মাধ্যমে, তিনি ছফর স্থগিত রেখেছেন। যাঁর অর্জিত হয়েছে ছফর করার মাধ্যমে, তিনি তা ছফরে অর্জন করেছন। আবার যাঁর এ, মানষিক শান্তি হাসিল হয়েছে কখনো সফর করার দ্বারা, কখনো সফর প্রত্যাখ্যান করার দ্বারা, তিনি তাঁর চাহিদা অনুপাতে পদক্ষেপ নিয়ে তা অর্জন করেছেন।

হযরত ইয়াকুব সূসী (রাহঃ) বলেন, সফরে চারটি জিনিষের একান্তই প্রয়োজন। (১) ইল্ম–এ ইলম তাকে পরিশুদ্ধ করতে থাকে। (অর্থাৎ ভ্রমণকারী মুসাফিরকে সঠিক পথে পরিচালত করবে এবং বাঁকা পথ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। (২) তাকোয়া–যা নাজায়েয থেকে ভ্রমণকারীকে হিফাজত করবে। (৩) শাওক–এটি ভ্রমণকারীকে ভালো কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করবে। অর্থাৎ মানসিক প্রফুল্লতা ও প্রশস্থতা, যা মুসাফিরকে তার অজীফা এবং নিদ্ধারিত আমলসূহের দিকে উৎসাহিত করে তুলবে এবং সফরের কারণে তার মধ্যে জড়তা ও অলসতার প্রশ্রয় দেবে না। (৪) খূলক চরিত্র মাধুর্য, যা মুসাফিরকে হিফাজত করবে। অর্থাৎ এর দ্বারা সে ক্ষিপ্ত ও বিরক্ত হবে না সেসব মানুষের ওপর, – যারা তাকে কষ্ট দেয়।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত চারটি জিনিষ যার মধ্যে না থাকবে তার জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে সফর না করাই উত্তম। এহেন ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হবে কোন বুযুর্গের খিদমতে নিজেকে সোপর্দ করা যিনি তাকে আদব দানে এবং শুদ্ধি করণে প্রয়াসী হবেন।

সাহচার্যের কিছু আদব

সাহচার্য তিনি প্রকার। (১) তোমার অপেক্ষা উচ্চ মর্তবার ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য। এ জাতীয় মানুষের সাহচার্য মূলতঃ খিদমতের শামিল। (২) তোমার অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর কারো সাহচার্য । এ জাতীয় সুহবাতে বড়র জন্য উচিৎ হবে ছোটর উপর দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন করা এবং ছোটর জন্য

উচিত হবে বড়জনের প্রতি তাজিম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। (৩) সম-পর্যায়ের লোকের সাহচার্য এটি হয়ে থাকে উৎসর্গ এবং প্রশস্তমনা ভিত্তিক সুহ্বাত। অর্থাৎ সমপর্যায়ের এক অপরের সাথে উদারতা ও উচ্চ মানসিকতার আচরণ অবলম্বন করাটা-ই শ্রেয়। অতএব, যার সৌভাগ্য হবে-তার অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার কোন শায়খের সুহ্বাত গ্রহণের, তার জন্য করণীয় হবে শায়খের নিকট থেকে যা প্রকাশ পাবে, তা যথাযথ স্থানে সুসামঞ্জস্য করা এবং তাঁর অবস্থাকে যথাসম্ভব মনে প্রাণে সমর্থন করে নেওয়া। আমি মানসূর ইবনে খালফ মাগরিবীকে বলতে শুনেছি যখন আমাদের জৈনক সুহৃদ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আবু উসমান মাগরিবীর সুহ্বাত কতদিন লাভ করে ছিলেন? তখন শায়খ মানসুর ইবনে খালফ (রহঃ) ভ্রূকুঞ্চিত চিত্তে দৃষ্টি দিলেন এবং বললেন, আমি তাঁর সহচর ছিলাম না বরং ছিলাম তাঁর-খাদেম হিসাবে।

যখন তোমার অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের কেউ তোমার সংসর্গে থাকে, তখন তার ত্রুটি বিচুতি দেখলে অবগত করে না দেয়া তোমার পক্ষ থেকে তার প্রতি খিয়ানত ছাড়া আর কিছুই নহে। আবু খায়র মুতায়নাঈ একদা জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাসীরের নিকট একথা লিখে প্রেরণ করে ছিলেন যে, মুরীদানদেরকে ভ্রান্ত ও অজ্ঞ রাখার বিষফল তোমাদেরই জন্য। কেননা, তোমরা স্বীয় সত্বায় নিমগ্ন হয়ে তাদের ইসলাহ ও শুদ্ধিকরণ বিলকুল ছেড়ে দিয়েছ। যদ্দরুণ তারা মুর্খ হয়ে আছে। আর যখন তোমরা এমন কারো সুহ্বাত বা সান্নিধ্যে থাক, যারা তোমার সমতুল্য তখন তোমাদের সমীচীন হবে যে, তার ত্রুটি -বিচ্যুতিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। আর যতটুকু সম্ভব হয় তার প্রতিটি কাজ ও কথাকে অনুপর্ম দৃষ্টি প্রদর্শনের মাধ্যমে যথাস্থানে নির্দ্ধারন করা। আর যদি অনুকুল দৃষ্টি প্রদর্শন ও তাবীলের পথ না থাকে, তখন তা নিজের নাফছেরই ত্রুটি মনে করে বিনয়ীভাব ও বন্ধত্বসুলভ আচরণ করা চাই।

আমি ওস্তাদ আবু আলী দাককাক থেকে শুনেছি, আহমদ ইবনে আবুল হাওয়ারী বলেছেন,আমি আবু সুলায়মান দারাণী (রহঃ) -এ খিদমতে একদা এ কথা উত্থাপন করেছিলাম, অমুক ব্যক্তিকে আমার অন্তর গ্রহণ করতে চায় না। হযরত সুলায়মান (রহঃ) এ কথার প্রেক্ষিতে বললেন, অন্তর তো আমারও কবুল করতে চাচ্ছে না তাকে, তবে হে আহমদ! হয়তো এ গরমিলটি আমদের স্বীয় নাফছেরই কারণে। আমরা যেহেতু সালিহীন বা নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভূক্ত নাই তাই সালিহীনদের সাথে আমাদের মহব্বতও নাই। এর আসল অর্থ হচ্ছে, হয়তো। তিনি সালেহ্ হবেন আর আমাদের অন্তর সালেহ্ নয়। তাই তাকে কুবল করে নিতে মন চায় না।

ইউসূফ ইবনে হুসাইন বলেন, আমি যুনুনন মিসরী (রহঃ) -এর খিমতে আরয করলাম ,আমি কি ধরনের লোকের সুহ্বাতে থাকব ? তিনি জওয়াব দিলেন, থাকতে হলে এমন ব্যক্তির সুহ্বাতে থাকো, যার কাছে মনের এমন গুপ্ত হতে গুপ্ততর ভেদ যা একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কেউ জানে না, নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পার।

জীবন সায়হ্নে বুযুর্গদের অবস্থা

উস্তাদ আবু আলী (রহঃ) বলেন, জীবন সায়েহ্ন সুফীয়ায়ে কিরামের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের পরিলক্ষিত হয়েছে কারো প্রকাশ পেয়েছে ভীতি-ভাব, আবার কারো প্রকাশ পেয়েছে আশার ভাব। কারো তখন প্রকাশ পেয়েছে এমন এমন জিনিষ অর্থাৎ আখিরাতের নায-নেয়ামত, যা তার জন্য তখনকার মত স্থিতিশীলতা ও মানসিক শান্তির কারণ হয়।

জীবন সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরের চেয়ে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া উত্তম

জনৈক বযুর্গের জীবন সন্ধ্যায় শয্যাশায়িত অবস্থায় বলা হল, 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ" বলুন। তিনি বললেন, তোমরা কখন্ পর্যন্ত আমার সাথে এমনটি বলতে থাকবে? অথচ আমি নিজেই আল্লাহ পাকের মহ্বতের অনলে পুড়ে যাচ্ছি। অপর একজনের বর্ণনা "আমি মামশাদ দীনূরী (রহঃ) -এর খিদমতে তার ওফাতের মুহূর্তে উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে একথা

জিজ্ঞেস করা হয়ে ছিল, আপনি রোগের অবস্থা অনুভব করেছেন? তিনি বললেন, স্বয়ং ব্যধিকেই জিজ্ঞেস করো, সে আমাকে কেমন অনুভব করছে? তারপর তাঁকে পুনঃ আরয করা হয়েছিল আপনি 'লা –ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলুন। এর সাথে সাথে তিনি মুখখানা প্রাচীরের দিকে করে বললেন, আমি আমার সত্বাকে সার্বিকভাবে আপনার (আল্লাহর) সামনে বিলীন করে দিয়েছি। অতএব, যে আপনাকে ভালবাসে তার প্রতিদান কি এই ?

আবু মুহাম্মদ দুবায়লী (রহঃ)–এর ওফাতের সময় তাকে যখন বলা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। তখন তিনি বললেন, এটি তো এমন একটি জিনিষ যা আমি অনুধাবন করতে বাকী নেই। আর এটির ওপরই নিজেকে বিলীন করেছি। এ পরই তিনিই কবিতা পাঠ করলেন–

(কবিতার অনুবাদ) 'আমি যখন তাঁর প্রেমিক হলাম, তখন তিনি অভিমানের পরিচ্ছদ পরিধান করে বিচ্ছেদের ভঙ্গিমা দেখাচ্ছিলেন। আর আমাকে তার গোলাম স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হলেন। অর্থাৎ, হক আদায়ের জন্য তা যথেষ্ট মনে করেননি। হযরত শিবলী (রহঃ) নিকট তাঁর এন্তেকালের সময় বলা হয়েছিল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"বলুন। উত্তরে তিনি এই কবিতাটি পড়লেন – **(কবিতার অনুবাদ)** তার রাজকীয় মহব্বত আমাকে বলে দিয়েছে, আমি ঘুষ গ্রহণ করি না। তোমরা তার কছম দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস কর, তারপর তিনি আমার হত্যার আগ্রহী হলেন কেন? কবিতাটির ভাবার্থ সম্ভবতঃ এই, ভালোবাসার আদালতে ঘুষের কোন প্রভাব খাটে না। এমনটি তো নয় যে, ঘুষের দ্বারা সেখানে জীবন বাঁচানো সম্ভব হয় । এখন তোমরা স্বয়ং বাদশাহকেই জিজ্ঞেস কর, কি অপরাধে আমাকে হত্যাকরা হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে (প্রেমিক সুলভ ভাষা)। এতে বে–আদবীর সন্দেহ করা ঠিক হবে না।

বর্ণিত আছে–হযরত আবুল হুসাইন নুরী (রহঃ)–এর নিকট তার ওফাতের সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন বলা হলে তিনি বললেন,আমি কি তাঁরই নিকট যাচ্ছি ? আবু আলী রোদবারী (রহঃ)–এর ঘটনা। তিনি বলেন, আমি ময়দানে এক যুবকের সাথে সাক্ষাত করলে যুবকটি আমাকে লক্ষ্য করে বললো, অমার প্রেমাস্পদের জন্য এটুকু কি যথেষ্ট নয় যে, সে আমাকে তাঁর মহববতে চিরলিপ্ত ও ব্যাকুল করে তুলেছে। আবু আলী (রহঃ) বললেন, এটুকু বলার পর পরই তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস আরম্ভ হয়। আমি তাকে বললাম –আপনি 'লা –ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। তিনি নিম্নোক্ত কবিতা উচ্চারণ করলেনঃ

অনুবাদ –আমার হে এমন মহানসত্বা– (আল্লাহ) যাকে ব্যতীত আমি অস্তিত্বহারা হওয়া অসম্ভব, যদিও তিনি আমাকে শান্তি ও কষ্ট দিবেন। হে আমার এমন মহানসত্বা (আল্লাহ) যিনি আমার অন্তারাত্মকে এমনভাবে অধিকার করে ফেলেছেন –যার অন্ত নাই। অনুরূপ হযরত জুনায়দ (রহঃ) –এর অন্তিম মুহূর্তে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমি তাঁকে ভুলে যাইনি যে, পুনঃ স্মরণের প্রয়াজন হবে।। তাঁরপর তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন–

(অনুবাদ)–আমার হৃদায়াকাশে সর্বদা সে মহান সত্বার উপস্থিতি যা আমার হৃদয়ের জাগরণ ও দীপ্তির উৎস। তাঁকে আমি ভুলি নাই যে, আমাকে আবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তিনিই আমার মালিক, সার্বিক ভরসা আমার তারই উপর। তাঁর সাথে রয়েছে আমার অটুট ও দৃঢ় সম্পৃক্ত।

আল্লামা কুশায়রী (রহঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌নে ইউসুফ ইস্পাহানি (রহঃ)– কে একথা বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবুল হাসান ইব্‌নে আবদুল্লাহ তয়মূসী (রহঃ)–এর থেকে শুনেছি। তিনি উলুশ দ্বীনূরী (রহঃ) এ মাধ্যমে মুযাইয়েনে কাবীর হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি তখন মক্কা মুকারমায় ছিলাম। আমার অন্তরে হঠাৎ অস্থিরতার সৃষ্টি হলে আমি মদীনায়ে তা্ইয়েবার উদ্দেশ্য করে শহর থেকে রওনা হয়ে বীরে মায়মুনা (মায়মুনা) [রাঃ]–এর কুপ– এর সন্নিকটে পৌছার পর অকস্মাৎ দেখতে পেলাম –মাটিতে শায়িত একটি যুবক। আমি তার কাছে একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম সে অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত। আমি তাকে

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার তালকীন দিলাম। সে তার চোখ দুটি খুলে কবিতা পড়ল–

(অনুবাদ) যদি আমি মৃত্যু বরণ করি–

এতে কি আসে যায় ? কেননা,

অন্তরটি আমার খোদাই প্রেমে পরিপূর্ণ।

আর শরীফ লোকের মৃত্যু সাধারণতঃ প্রেম রোগেই হয়ে থাকে।

এর পরই একটি মাত্র আওয়ায দিয়ে সে যুবকটি ইনতিকাল করল। আমি তাকে গোসল ও কাফন দিয়ে জানাযার নামায আদায় করলাম দাফনের কাজ থেকে অবসর হলে আমার অন্তরের সে অস্থিরতা স্তিমিত হয়ে গেল এবং সফরের ইচ্ছা শেষ হয়ে গেল। অতঃপর আমি মক্কা মুযাজ্জামায় ফিরে আসি।

ফায়দা ঃ সম্ভবত ঃ আল্লাহ তালালা যুবকটির খিদমতের জন্যই তাঁর অন্তরে সফরের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে ছিলেন।

আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সুফীর কাছ থেকে শুনেছি। তিনি বর্ণনা করেছেন আবু আবুদল্লাহ ইবনে খাফীজ (রাহঃ)-এর মাধ্যমে। তিনি বলেন, আবু হাসান মুযয়্যান (রহঃ) থেকে আমার শোনার সুযোগ হয়েছিল। হযরত আবু ইয়াকুব নহরজুরী (রহঃ) যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন, আমি তখন তাঁর কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার আবেদন জানালে, তিনি মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, আমাকে একথা বলেছো ?

আমি সে মহান সত্বার কছম খেয়ে বলছি, যিনি মওতের স্বাদ গ্রহণ থেকে চিরমুক্ত, তাঁর এবং আমার মাঝখানে একমাত্র 'কিবরীয়াই 'তথা মহানত্বের আবরণ ছাড়া অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। এটুকু বলেই নশ্বর পৃথিবী থেকে তিনি মহান আল্লাহর কাছে চলে যান। হযরত আবুল হাসান মুযায়্যান (রহঃ) এ মর্মান্তিক ঘটানাটি যখনই বর্ণনা করতেন, তিনি তখন কেঁদে ফেলতেন। আর তিনি স্বীয় দাড়িগুলো ধরে বলতেন, বড়ই লজ্জার

কথা, আমার ন্যায় একজন হাজাম আল্লাহর এমন একজন ওয়ালীকে কলেমায়ে শাহাদাত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় জানিয়ে ছিলাম।

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত ঘটনাবলী হতে কেউ হয়তো এ ধারণা করে নিতে পারে যে, (নাউযু বিল্লাহ) এ সকল বুযুর্গগণ আল্লাহর যিকির হতে বিরত ছিলেন। আল্লাহর কসম, ব্যপার আসলে এমন নয়। বরং আল্লাহর মৌখিক যিকিরের গন্ডি পেরিয়ে স্বয়ং আল্লার ফিকিরে নিজেদেরকে সঠিক উৎসর্গ ও ন্যস্ত করায় নিমগ্ন ছিলেন তাঁরা' আর এটি উচ্চ মর্যাদাসীনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু এর চেয়েও তুলনামূলক উচ্চ মর্যাদার বিষয় হবে যদি মৌখিক যিকির এবং আন্তরিক ফিকিরের সমন্বয় সাধন করায় এমনটি পরিলক্ষিত হয়েছে আল্লাহর অধিকাংশ বড় বড় ওয়ালীদের বেলায়। আমি এ প্রসঙ্গে একাধিক ঘটনা একত্রিত করেছি। তার কারণ, মুতাআখখিরীন তথা একালের কতপিয় বযুর্গদেরও এ জতীয় ঘটনা ঘটেছে। উহাহরণ স্বরূপ আমাদের পীর সাহেবের জনৈক মুরীদ হযরত শেরখান (রহঃ)–এ ঘটনা পেশ করা যেতে পারে। তিনি যখন মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হন, লোকজন তাঁকে আল্লাহর যিকিরে তালকীন করছিল। তিনি তাঁদের অনুসরণ করেননি। লোকজন পীর সাহেবকে তা জানালে পীরসাহেব তাশরীফ আনলেন। পীরসাহেব জিজ্ঞেস করলেন,–তোমার অবস্থা কেমন ? জওয়াব দিলেন, 'আলহামদুল্লিাহ ভালো। অসুবিধা এটুকু যে, মানুষ আমাকে আল্লাহর ধ্যান থেকে সরিয়ে তাঁর নামে মনোনিবেশ করেনের চেষ্টা করছে। আপনি এদেরকে বারন করে দিন। আমি পূর্বসুরী আওলীয়াগণের এ সব ঘটনা বর্ণনা করার কারণ– উত্তরসুরী – মুতাখ্খিরীনদের সম্পর্কে কু-ধারণা যেন করা না হয়।

আল্লাহর মা'রিফাতের কিছু নিদর্শন

বর্ণিত আছে –আল্লাহ পাকের খাঁটি মা'রিফাত অর্জনকারী আরিফ যা কিছু বলেন, তাঁর বলার আওতা থেকে তাঁর মর্যাদা থাকে আরো উর্ধ্বে। এদিকে মা'রিফাত হারা একজন শুষ্ক আলিম মুখে যা বলেন তাঁর বাস্তব অবস্থা এর চেয়ে থাকে অরো নিম্নমানের। গ্রন্থকার বলেন, আলোচ্য

বক্তব্যের কারণ এই যে, আরিফের হাল বা অবস্থা তার ক্বালব বা কথার উর্ধ্বে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে একজন মা'রিফাত শুন্য আলিমের কাছে থাকে শুধু ক্বালব বা কথা। বাস্তব ক্ষেত্রে তার কথা ও কাজে সমাঞ্জস্য থাকে না। যদ্দরুন কথার স্তর থেকে তিনি সাধারণতঃ নিম্নস্তরের হয়ে থাকেন।

হযরত রুবাইম (রহঃ)-এর বাণী –আরিফ বা খোদার পরিচিতি ও সান্নিধ্য অর্জককারীদের 'রিয়া' তথা লোক দেখানো কাজ মুরীদদের ইখলাস (একনিষ্ঠতা) অপেক্ষা উত্তম। গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত উক্তির কারণ হল– 'রিয়া' দ্বারা এখানে শরীয়তের পারিভাষিক নিষিদ্ধ রিয়া নয়। বরং আভিধানিক রিযা-ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, স্বীয় আমল মুরীদদের হীতার্থে দেখানো কিংবা প্রকাশ করা। আর একথা সুবিদিত যে, ব্যক্তিগত উপকারের সাথে সাথে পরোপকারের দিকটি সংযোগ হলে তা অপেক্ষিক ভাবে শুধু ব্যক্তিগত উপকারের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) এর খিদমতে এ আবেদন করা হয়েছিল যে, আরিফ কে ? জওয়াবে তিনি বললেন পাত্রের রঙ যা পানির রঙ ধারণ করে তদনুযায়ী। এ কথার অর্থ – আরিফ তিনি স্বীয় ঘটনাবলী (শরীয়তে যা অনুমোদিত) এবং অবস্থায় যিনি অনুসারী। গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, এ কথার অর্থ এই নয় যে,আরিফ 'ইবনুলওয়াক্ত' তথা কালোপযুগী বা অবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বরং এর অর্থ – আবুল ওয়াক্ত তথা কালজয়ী বা অবস্থার প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ তিনি সর্বাস্থায় –হক সমূহের কড়া দৃষ্টি রাখেন কারণ তাজাল্লী এবং ওয়ারিদ তথা খোদা প্রদত্ত্ব মননতার আদব হচ্ছে, অবস্থার হক গুলো যথাযথ আদায় করা। গ্রন্থকার (রহঃ) আরো বলেন, আমি শেষের দুইটি উক্তি আমার শায়খের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত ভাবে শুনে ছিলাম। তারপর আমি আমার রুচি অনুযায়ী উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। আর এ রুচিটুকুও আমার শায়খের সুশীতল সান্নিধ্যেরই ফসল।

আরিফগণের চোখে কাঁন্নার প্রাধন্য থাকে না ঃ

হযরত আবু সাঈদ খায্যায (রঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আরিফ কখনো এমন অবস্থায় পৌঁছে থাকেন কি যে, তাঁরা বাহ্যিক

কাঁন্নাকাটির উর্ধ্বে চলে যান ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা কাঁন্নাকাটি এমন একটি জিনিষ, যা আল্লাহ্র পথে আরোহণের সময় বান্দার দ্বারা এটি হয়ে থাকে। তারপর যখন বান্দাহ্ নৈকট্য লাভের হাকীকতের মনযিলে গিয়ে স্থান লাভ করেন, আর আস্বাদন করতে থাকেন সফল যাত্রার অমৃত সুধা তারই করুণায়, তখন তাঁর থেকে কাঁন্নাকাটির ব্যকুতা হ্রাস পেয়ে যায়। গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বাণী দ্বারা আবার কাঁন্নাকাটি একেবারেই প্রশমিত হওয়ার কথাও বলা হয়নি। বরং সচরাচর কাঁন্নাকাটি হ্রাসের কথা বলা হয়েছে। আবার এ সচরাচর কাঁন্নাকাটি প্রশমিত হওয়াটির দিকটি একমাত্র বাহ্যিক ও চাক্ষুসের সাথে সংযুক্ত । আত্মিক কাঁন্নাকাটির বেলায় নয়। তাছাড়া এ বিধি প্রযোজ্য হবে সংখ্যাধিক্যের নিরিখে। কেননা, আল্লাহ্র পথের সালিক বা ভক্তবৃন্দের যোগ্যতা ও প্রতিভা অবস্থা ভেদে বিভিন্ন মুখী থাকে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহব্বত

মহব্বতের কতিপয় নিদর্শন

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুয়ায (রহঃ) বলেন, মহব্বতের মূল কথা হচ্ছে মাহ্বুব বা প্রেমাস্পদের বৈরী আচরণের দ্বারা মহব্বতে ভটা না পড়া। আর তার অনুগহের ফলে মহব্বত বৃদ্ধি পাওয়া । গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, 'বৈরী আচরণ' দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে 'অনুগ্রহের মাত্রা কমিয়ে দেয়া যা প্রবৃত্তি চাওয়ার অনুকুলে হয়। তার পাশাপাশি প্রেমাস্পদের অনুগ্রহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– অবদানে বৃদ্ধিকরণ। আরবীর অনুবাদক হযরত মুফতী শাফী ছাহেব (রহঃ) বলেন, গ্রন্থকার جِفَاءٌ এর ব্যাখ্যায় اَلْمَلَائِمُ لِلنَّفْسِ (অর্থাৎ নাফছের চাওয়ায় অনুকলে) এ সংযোগ করার দ্বারা তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ প্রয়েজনীয় জিনিষের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হচ্ছে, আমরা সাধারণতঃ যা স্বল্প অবদান বলে জ্ঞান করে থাকি পক্ষান্তরে তা তুচ্ছ বা স্বল্প অবদান আদৌ নয়। বরং অবদানের রঙের বা শিরোণামের পরিবর্তন মাত্র। কথা এতটুকু বর্তমানে তা প্রবৃত্তির চাহিদা মুতাবিক হয়নি। যদিও

সমষ্টিগত দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায় তাও অধিক অনুগ্রহই।

خواجه خود روش بنده پروری داند

'খাজারই জানা আছে – বান্দাহর প্রতিপালন হয় কিসে।'

এরি প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা লক্ষ্যণীয় –যথা –

عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم

'তোমরা কোন বস্তুকে হয়তো অপছন্দনীয় ভাবছো, অথচ সেটি তোমাদেরই জন্যে কল্যাণকর।'

এ জন্যই -মুহাককিকগণ বলেছেন–

در طريقت هرچه پيش سالك ايد خير اوست

'তরীকতের পথের যাত্রীর সামনে যা কিছু আসে, তার কল্যাণেরই নিমিত্ত আসে।

এ তত্ত্বটি–ই আরব ও আজমের পথিকৃৎ হযরত মাওলানা মাহ্মুদ হাসান সাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) তার একটি কবিতায় বলেছেন–

اس کے اغوش غضب مین هین هزارون رحمت

اس کے هر لطف مین هین سیکرون الطاف وکرم

করুণামাখা তিক্ত কোলে তাঁর
গুপ্ত রয়েছে কিন্তু অনন্ত রহমত,
প্রতিটি দয়ায় বিরাজমান তাঁর
অকৃতিম মায়া ও অসীম অনুগ্রহ।

মহব্বত ও মা'রিফাতের পারস্পরিক প্রাধান্য

হযরত সামনূন (রহঃ) মা'রিফাতে উপর মহব্বতকে প্রাধন্য দিয়ে থাকতেন। অধিকংশদের মতে মহব্বতের তুলনায় মা'রিফাত প্রাধান্যের দাবীদার। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমার ধারাণ মতে মূলগত দিক দিয়ে মা'রিফাতের তুলনায় মহব্বতের স্থান উর্ধ্বে। কিন্তু ফলাফলের বিবেচনায় মা'রিফাতই উর্ধ্বের ।

অনুচ্ছেদ ঃ শাওক (উৎসাহ ও উদ্দীপনা) সম্পর্কে

শাওকের কিছু নিদর্শন ঃ হযরত আবু উসমান (রহঃ)–এর ভাষ্যা শাওকের নিদর্শন হচ্ছে, পারলৌকিক শান্তির আশায় মৃত্যু প্রিয় হওয়া। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, শুধু মৃত্যুর মহব্বতের ফলে এসব লোক ওসব উদাসীন অলস দুনিয়াদারদের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন, যারা জাগতিক আরাম–আয়েশে মত্ত্ব থাকার দরুন মৃত্যুকে পছন্দ করে না। رَاحَتْ দ্বারা সে সফল চরমপন্থীদের ভ্রান্ত ধারাণাকে খণ্ডানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যারা উগ্রমানসিকতার দরুণ বলে থাকে, আখিরাতে শান্তি আসুক আর না-ই আসুক মৃত্যু মাত্রই আমাদের কাছে প্রিয় । এ উগ্রতা তাদের মাতলামীর ফসল বৈ নয়। তা না হলে– পরকালের অসহনীয় দুঃখ যাতনা বরদাশত করার শক্তি কার আছে ? আল্লাহ্ পাক তা থেকে আমাদের সকলকে নাজাত দান করুন

অনুচ্ছেদ ঃ মাশায়িখগণের অন্তরের নিরাপত্তা ঃ

শায়খের অন্তরে ব্যথা দেয়ার পরিণতি ঃ

আমি উস্তাদ আবু আলী দাক্কাকাক (রহঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ স্বীয় শায়খের বিরুদ্ধাচরণ প্রতিটি বিচ্ছেদের কারণ। এ কথার অর্থ হল, যে ব্যক্তি নিজের শায়খের বিরোধিতা করে, সে তার তরিকায় আর টিকে থাকে না। অধিকন্ত তাদের আত্মিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে বসবাস করে একই স্থানে । সুতরাং যে ব্যক্তি কোন শায়খের

থাকে আর অন্তরে প্রশ্ন রাখে তার শায়খের উপর সে সংস্পর্শে চুক্তি ও দায়িত্ব ভঙ্গ করল। এখন তার জন্য তাওবা করা ওয়াজিব। অধিকন্তু সুফীয়ায়ে কিরামগণ বলেছেন, মাশায়িখগণের বিরুদ্ধাচরণ করার সম্পূরক কোন তাওবা বা মার্জনাই নেই। গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, ওয়াজিব দ্বারা এখানে শরীয়তের ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়। বরং এর অর্থ হল–তাওবা মূলতঃ সে নির্দিষ্ট শায়খের দ্বারা উপকার হাসিল করার পূর্ব শর্ত। কেননা, উপকারিতা অর্জনের পূর্ব শর্ত মানসিক প্রফুল্লতা ও প্রশস্ততা। যা সাধারণতঃ চলে গেলে ফিরে আসে না। কিন্তু এ নীতিমালা সর্বক্ষেত্রে নয়, সংখ্যাধিক্যের বেলায় প্রযোজ্য।

শায়খের সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় – শায়খের ইন্তিকালের পর

শায়খ ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবীওয়ারদী (রহঃ) থেকে আমি শুনেছি, যার উপর শায়খ সন্তুষ্ট হন, শায়খের জীবদ্দশায় প্রতিদান প্রদান করা হয় না। কারণ এমতাবস্থায় তার অন্তরে শায়খের মর্যাদা ও গুরুত্ব কমে যাওয়ার আশংকা প্রবল। শায়খ যখন ইন্তিকাল করেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালা শায়খের কৃপা দৃষ্টির সুপ্রতিদান প্রকাশ করে থাকেন। অনুরূপ শায়খের প্রতি যার অন্তর বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে উঠবে, তার অশুভ পরিণতিও শায়খের জীবদ্দশায় দেয়া হয় না। তাও এজন্যই দেয়া হয় না যে, শায়খ তার উপর হয়তো দয়া ও অনুগ্রহহীন হয়ে পড়বেন। যেহেতু মেহেরবাণী ও করুনা তাঁদের স্বভাব চরিত্রে সৃষ্টিগত ভাবেই সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। তাই শায়খের ইন্তিকালের পর পরই আরম্ভ হয় সে অসন্তুষ্টির শোচনীয় পরিণাম।

গ্রন্থকার (রহঃ) বলেন, এটি একটি বৈচিত্রময় সুক্ষ্ম রহস্য। যে সম্পর্কে নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক লোকই অবহিত। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রেক্ষিতে। সর্বক্ষেত্রে নয়। কাখনো কখনো ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। এ উক্তির যৌক্তিকা স্বয়ং এতে-ই বিরাজমান।

হযরত মুফতী শাফী ছাহেব (রহঃ) (অনুবাদক) বলেন, শায়খের অসন্তুষ্টির বিষফল–তাঁর জীবদ্দশায় না দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ তাকে

অবকাশ প্রদান করা। এ সুযোগে সন্তুষ্ট করে নেবে সে তার শায়খকে। যেমনটি আল্লাহ্ পাক গুনাহ–লেখক ফেরেস্তাগণকে দিয়ে করে থাকেন। আমল নামায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহ্ লিখা থেকে এদেরকে বিরত রাখা হয়, যতক্ষণ সে গুনাহ্ হতে তাওবা ইত্যাদির মাধ্যমে বিরত হয়ে আসার সম্ভবনা থাকে। আর এ যৌক্তিকতা একমাত্র মহান আল্লাহ্র সুপরিসর রহ্মতের আলোকে বিবেচ্য । শায়খের হক আদায়ের গুরুত্বের দিকটি কঠোর বাঞ্চনীয় হওয়ার যৌক্তিকতা যেমনি লক্ষ্যণীয় ছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ সামা সম্পর্কে

সামা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা

আল্লামা কুশায়রী (রহঃ) সনদের সাথে হযরত জুনায়দ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলতেন, 'সামা , (ধর্মীয় সঙ্গীত) ঐ ব্যক্তির জন্য হবে ফিৎনা যে, সেটির প্রত্যাশী হবে। আবার এটি ঐ ব্যক্তি জন্য আরামের উপকরণ হবে। যে ঘটনাক্রমে শুনে ফেলে। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, প্রত্যাশী হওয়ার অর্থ হচ্ছে–ইচ্ছাকরে মানসিক চাপ বিনে ভান করে তাতে লিপ্ত হওয়া। আর 'মুসাদাফাত' এর উদ্দেশ্য হবে, কখনো এর প্রতি মানসিক চাপ সৃষ্টি হওয়া। হযরত আবু আলী (রহঃ) –এ খিদমতে 'সামা' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন "কত ভালো হতো যদি আমরা স্বাভাবিক ভাবে তা ছেড়ে দিতে সক্ষম হতাম"। (অর্থাৎ এতে উপকারিতাও নেই, নেই কোন অপকারিতও।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ বলেন, আমি হযরত জুনায়দ (রহঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন তোমরা কোন মুরিদকে দেখবে, সে 'সামা'এর প্রতি আগ্রহী তখন তোমরা জেনে নিবে ,তার মধ্যে ভবঘুরে ভাব রয়েছে।

হযরত আবু সুলায়মান দারাণী (রহঃ)–এর নিকট 'সামা' সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি উত্তর দিলেন, যে অন্তর সুন্দর কণ্ঠের ইচ্ছুক হবে, সে ক্ষীণ অন্তর এবং দুর্বল চিত্তের লোক; আর 'সামা' তার ঔষধ স্বরূপ। উদাহরণ তার কচি শিশু। যখন সে শুইতে চায় তখন মধুর কণ্ঠ ইত্যাদি

দ্বারা তার নিদ্রার ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আবু সুলায়মান (রহঃ) আরো বলেন, মধুরকণ্ঠ বা সুন্দর আওয়াজ অন্তরে অভিনব কিছু পয়দা করে না। বরং যা কিছু পূর্ব হতে অন্তরে বিরাজমান আছে, তাতে কিঞ্চিত নাড়া দেয় মাত্র।

আমি উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক হতে শুনেছি, এক মজলিসে আবু আমর ইবনে জায়দ, হযরত নাছরাবাদী এবং কতিপয় লোক ছিলেন। নাছরাবাদী (রহঃ) বলেন, আমার মন্তব্য হচ্ছে, যখন কিছু সংখ্যক লোক একখানে জামায়েত হয়, তখন এদের মধ্যে একজন কিছু বলা চাই। (এতে প্রতীয়মান হয় তাঁর মতে 'সামা' মুবাহ্) এবং অবশিষ্ট সবাই চুপ থাকবে। এটি কমপক্ষে তার গীবত করা অপেক্ষা উত্তম। হযরত আবু আমর বললেন যদি তোমরা ত্রিশ বছর পর্যন্ত গীবত করতে থাকো তবে 'সামা' এর অবস্থায় মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন অবস্থার প্রকাশ ঘটানো থেকে উত্তম হবে।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যের কারণ হচ্ছে, গীবত এমন স্পষ্ট গুনাহ্, গীবতকারী নিঃসন্দেহে এটিকে গুনাহ্ মনে করে থাকেন। এদিকে 'সামা' এর সময় এমন অবস্থা প্রকাশ করে যেটি পক্ষান্তরে তার মধ্যে, একটি বাতেনী এবং অস্পষ্ট গুনাহ্, যার কর্তা একে গুনাহ বলে স্বীকারই করে না। বরং কখানো কখনো এটি করায় নিজেকে পূর্ণতা এবং নৈকট্যের অধিকারীও ভেবে থাকে। আর একথা সুবিদিত যে, এ জাতীয় গুনাহ্ নিতান্তই ধ্বংসাত্মক, মারাত্মক । বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে আঁ হযরত (সঃ)- এর মুলাকাতে ধন্য হন। আঁ হযরত (সঃ) এরশাদ করেছিলেন 'সামা'-তে ভ্রান্তি বেশী বেশী হয়ে থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এঁরা হচ্ছেন সে সকল আকাবিরন যাঁরা 'সামা সম্পর্কে কিঞ্চিত নমমীয়তা প্রদর্শন করে থাকতেন, অথচ দেখুন এতদসত্ত্বেও কতটুকু কঠোরতা অবলম্বন করে গেছেন তাঁরা এবং বিভিন্ন প্রকার শর্তারোপ করে গেছেন। তাহলে একটু অনুমান করুন, সে সকল আকাবিরদের অবস্থা যাঁরা সূচনা হতেই এ বিষয়ে কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন

মোদ্দা কথা হচ্ছে, 'সামা' এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী। আমারা আমাদের নিরাপত্তা, শান্তি এবং সৎকাজে সুদৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আল্লামা মুফতী মোঃ শফী (কুদ্দিছা ছিররুহ) বলেন, এক্ষেত্রে আমার শায়খ মূল গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ)- এর সে উক্তিটিও উল্লেখ করে দেখা সমীচীন মনে করি, যা আমি তাঁর বরকতময় ভাষ্য হতে একাধিকবার শুনার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছি। তিনি বলতেন (ধর্মীয় সঙ্গীত) এর ব্যপারে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় যেটি তা হচ্ছে, তাসাওউফ- এর চার ছিলছিলার মধ্য হতে তরীকত পন্থী মাশায়েখগণ তা করণীয় হিসাবে কাউকে নির্দেশ দেননি। অথচ পীর সাহেবদের আদিষ্টবাহ মা'মূল এমনও ছিল যা অভিজ্ঞতার নিরিখে উপকারী সাব্যস্থ হওয়ার ভিত্তিতে ব্যবস্থা স্বরূপ যোগীদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন নিঃশ্বাস বিরত রাখা ইত্যাদি। যেমনটি করেছিলেন হজুর (সঃ) যুদ্ধে পরীখা খননের ব্যাপারে । এ পদ্ধতি তিনি পারস্যের কাছ থেকে নিয়ে ছিলেন।

সারকথা ঃ 'সামা' যদি অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোন থেকে উপকারীই অনুমিত হতো, যেমনটি হয়েছে অন্যান্য উপকারী জিকির ও ওজিফার তালিম। তাহলে অবশ্যই এ 'সামা' বা ধর্মীয় সঙ্গীতেরও তালিম দেয়া হতো। আল্লাহ তাআলা প্রকৃত তাওফিক দাতা। তিনিই সর্বস্তরের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র।

দ্বিতীয় অংশ

রূহে তাসাওউফ

(ইমাম শায়রানী (রহঃ) – এর তাবাকাতে কুব্‌রা হতে চয়নকৃত)

হযরত আলী (রহঃ) এর কতিপয় বাণীঃ

আমল কবুল হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে

হযরত আলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমল করা অপেক্ষা আমল কবুল হওয়ার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত আর্থাৎ সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে তা মাক্কবুল তথা গ্রহণীয় হওয়ার উপযোগী বানাও। কেননা আমল যতই ছোট হোক না কেন তার সাথে যখন তাকওয়া এবং ইখলাস যুক্ত হবে তখন আর তা ছোট থাকে না। আর যে আমলটি আল্লাহ্ তালার কাছে মাক্কবুল হবে সেটিকে আবার তোমারা ছোট ভাব কিরূপে।

হযরত আবদুল্লা ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বাণী কোন বুযুর্গের সাথে পথ চলা সম্পর্কে

একদা হযরত আবদুল্লা ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে কতিপয় মানুষ তাঁর সঙ্গী হলে তিনি বললেন, আমার সাথে আপনাদের কোন প্রয়োজন আছে কি ? তারা আরজ করল, জি না। তিনি বললেন –তাহলে আপনারা ফিরে যেতে পারেন। কেননা এভাবে পেছনে যারা চলে তাদের প্রকাশ পায় হীনতা আর যার পেছনে চলে তার অহংকারের ফিতনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা প্রবল।

আমলের সযত্ন প্রয়াস অপেক্ষা পার্থিব অনাসক্তি শ্রেষ্ঠ

হযরত আবদুল্লা ইবনে মাসউদ তাঁর শাগরিদদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা তো নফল এবং মুজাহাদায় সাহাবায়ে কেরাম অপেক্ষা অধিক অগ্রগামী। অথচ তাঁদের অবস্থা ছিল এই যে, তাঁরা দুনিয়ার মোহ

থেকে বিরাগমনা এবং আখিরাতের প্রতি আসক্তিতে তোমাদের চেয়ে বর্ণনাতীত অগ্রগামী ছিলেন।

সারকথা –সাহাবায়ে কেরামের আমল সমুহ তুলনামূলক উত্তম হওয়া অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু তাঁদের আসল আমল নফল এবং মুজাহাদার আধিক্যে সীমিত ছিল না, বরঞ্চ তাদের আমলের মূল বিষয় ছিল দুনিয়াকে সার্বিকভাবে পরিহার করা এবং আখিরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকা। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হল যে, আমলের বেলায় অত্যধিক গুরুতারোপের তুলনায় যুহ্‌দ তথা আখিরাতের আকর্ষণে দুনিযার প্রতি অনিহা প্রদর্শন করাই শ্রেয়।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) –এর বাণীঃ

দুশমনি বা বৈরিতা রাখা চাই মন্দ আমলের প্রতি আমলকারীর সাথে নয়

হযরত আবুদ দারাদা (রাঃ) বলেন –যদি তোমাদের কোন মুসলমান ভাই হতে কোন প্রকার গুনাহ্ প্রকাশ পায়, তখন সে গুনাহ্‌কে নিন্দা কর, কিন্তু মুসলমানকে নয়। যখন সে গুনাহ্ ছেড়ে দিবে তখন সে তোমাদের ভাই। এ প্রেক্ষিতে তিনি আরো বলেন –যদি তোমাদের কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন অবস্থায় পরিবর্তন দেখা দেয়, কিংবা সে বক্রতা অবলম্বন করে, তখন একে কেন্দ্র করে তাকে ছেড়ো না যেন। কারণ ভাই এক সময় বাঁকা পথ ধরলে অন্য সময় সে সরল ও নিষ্ঠবানও তো হয়ে যায়। উপরোক্ত মতটি ছিল হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, ইব্রাহিম নাখয়ী এবং পূর্বসূরী একদল আলেমগণের। তাদের মতানুসারে গুনাহ্ প্রকাশ পেলে মুসলমান ভাই হতে সম্পর্কচ্যুতি যথার্থ নয়। এসব বুযুর্গগণের অভিমত হচ্ছে,– আলেমের অন্যায়, অপরাধ নিয়ে চর্চা করবে না। কেননা, আলেমের মান হল তাদের থেকে কখনও ত্রুটি বিচ্যুতি-সংঘিটিত হলেও আরেক সময় এর সংশোধন হয়ে ফিরেও আসে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)– এ বাণীঃ

দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখবে দৈহিকভাবে, আন্তরিকভাবে নয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সচারাচর বলতেন, হে মানুষঃ দুনিয়ার সাথে শুধু বাহ্যিক সম্পর্ক রাখ, আত্মিকাভবে এর থেকে পৃথক থাক। অর্থাৎ মন রাখ আল্লাহর সাথে দুনিয়া যেন অভীষ্ট লক্ষ্য না হয়ে যায়।

হযরত হোযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) – এর বাণীঃ

প্রয়োজন অনুসারে দুনিয়া হাসিল করা উত্তম হওয়া সম্পর্কে

তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য হতে যে সব লোক বেশী ভাল নয়, যারা আখিরাতের উদ্দেশ্য দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়।। বরং উত্তম মানুষ তারা সামর্থ ও সুযোগ অনুপাতে যারা দুনিয়া আখেরাত উভয়টি হাসিল করে ।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)–এর বাণীঃ

রোগের ফজিলত

তিনি বলেন, রোগ এমন একটি জিনিষ যেখানে লোক দেখানো এবং খ্যাতি লাভের কোন অবকাশ থাকে না। বরং এতে শুধু নিরংকুশ সওয়াব।

হযরত আবাদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এ বাণী ঃ

বিবেক বুদ্ধিহ্রাস পাওয়া

তিনি বলেন, এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষের বিবেক বুদ্ধি উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি তখন হাজারে একজন মানুষও বিবেকবান পাওয়া যাবে না।

হযরত হাসান (রাঃ) –এ বাণী

ইলম অর্জন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ঃ

হযরত হাসান (রাঃ) স্বীয় সাহেবযাদাহ এবং ভ্রাতুস্পত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, ইলম হাসিল কর। আর যদি তোমাদের মধ্যে এ ক্ষমতা না থাকে তাহলে কম পক্ষে তা নিয়ে তোমাদের গৃহে রেখে দাও। তাহলে অন্যদের জন্য উপকার বয়ে অনবে এবং নিজেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

হযরত হুসায়ন (রাঃ)–এ বাণী অভাবীদের প্রতি বিরক্ত না হওয়া সম্পর্কে

তিনি বলেন, মানুষ অভাবের সম্মুখীন হয়ে তোমাদের কাছে যে আসছে, তা তোমাদের জন্য খোদা প্রদত্ত নেয়মাত। এ সব নেয়ামত সম্পর্কে তোমাদের মন সংকীর্ণ না হওয়া উচিত। এমনও হতে পারে এসব নেয়ামত সামগ্রী তোমাদের জন্য বিপদে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

হযরত হাসান বছরী (রঃ) –এর বাণী

শায়তানী ওয়াসওয়াসা এবং প্রবৃতত্তির ধোঁকার মধ্যে পার্থক্য

তিনি বলেন, যে ওয়াসওয়াসা কোন গুণাহ্ সম্পর্কে অন্তরে হঠাৎ আসে এবং বারংবার তার প্রতি আকর্ষণ না দেখা দেয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, এটি হচ্ছে ইবলীসের পক্ষ হতে সৃষ্টি করা চাপ। আর যদি একই গুনাহর আসক্তি অন্তরে একাদিকবার সৃষ্টি হয়, তখন প্রবৃত্তির পক্ষ হতে সৃষ্ট বলে এটিকে ধরে নিতে হবে। প্রতিকার হল রোজা নামাজ এবং অত্যধিক মুজাহাদার মাধ্যমে এর মোকাবেলা করা।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত প্রতিকারে তাত্বিক বিশ্লেষণ হচ্ছে এই যে, কুখ্যাত শয়তানের উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাহাদেরকে কোন গোনাহতে জড়িত করে দেয়। বান্দার যদি গোনার ধারণাকে এবার অন্তর থেকে অপসারিত করতে সক্ষম হয়ে যায়। তখন পুনরায় আর একটি গোনাহর ওয়াসওয়াসায় নিক্ষেপ

করার মাধ্যমেও তার কু-মতলব সাধন সম্ভব। শুধুমাত্র একটি গোনাহর পেছনে পড়ার তার কোন দরকার নাই। পক্ষান্তরে নাফস্ প্রবৃত্তি কেবল গুনাহ্ করানোর পিছনেই লেগে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পূরণ না হবে কিংবা মোজাহাদার মাধ্যমে প্রতিহত না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আসক্তি অব্যাহতই থাকবে।

কথার পূর্বে ফলাফল নিয়ে চিন্তা করা

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, পূর্বসূরী আছলাফগণ বলতেন, জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ তার অন্তরের হয়ে থাকে। যখন; সে কিছু বলতে চায় তখন প্রথমে অন্তরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যখন এতে কিছু উপকার দেখে তখন বলে, অন্যথায় বিরত থাকে। এদিকে মুর্খ বোকার অন্তর তার মুখের তালে চলে। সে অন্তরের দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করে না, ফলে মুখে যা আসে তাই বলে দেয়।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যে (রহঃ) -এর বাণীঃ

প্রয়োজন অনুযায়ীপার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করা কল্যাণকর

তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির জীবনে কল্যাণের লেশটকু নেই, যে এতটুকু পরিমাণ পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করেনি। যা দ্বারা স্বীয় দ্বীনকে হিফাজত করতে পারে এবং রক্ষা করবে তার স্বাস্থ্যকে।

মহিলাদের সাথে আচরণে

সতর্কতা অবম্বলন করা, হোক না সে বৃদ্ধা

হযরত সাঈদ ইবনে সুসায়্যেব (রহঃ) বলেনঃ নারীদের চেয়ে বিপদ জনক আমার জন্য আর কিছুই নেই। অথচ তাঁর বয়স তখন ৮৪ (চৌরাশি) বছর।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফী (রহঃ) এর বাণী ঃ

অসৎ ব্যবহারের বিনময়ে সৎ ব্যবহার

তিনি বলেন, সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান নয়, যে ঐ ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার না করে যার সাথে সে আচার-আচরণ ও সমাাজিক জীবন যাপনে বাধ্য। যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা তার মুক্তির কোন পথ করে দেন।

হযরত আলী (যায়নুল আবেদীন) ইবনে হুসায়েনের বাণীঃ

উচ্চতর ইখলাস

আল্লাহ্ পাকের খাঁটি বান্দা যারা, আর যারা গায়রুল্লাহতে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাদের ইবাদত হয়ে থাকে আল্লাহ্ তায়ালার শোকর জ্ঞাপনার্থে। তাদের দোযখের ভয় কিংবা জান্নাতের প্রত্যাশায় হয় না।

উপরোক্ত বাণীর অর্থ এমন নয় যে, সব বান্দাদের দোযখের ভয় কিংবা বেহেশতের আগ্রহ হয় না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তাদের ইবাদত শুধু ভয় ও আশায় হয় না।

হযরত মু'তারিফ ইবনে আবদুল্লা শিক্ষীর (রহঃ) -এর বাণীঃ

আত্মগরিমা হতে অনুশোচনা উত্তম

তিনি বলেন, আমার কাছে এটি পছন্দনীয় যে, রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করি আর দিনের বেলায় অনুতাপ বোধ করি। অর্থাৎ অনুতপ্ত হই । এটি আমার কাছে পছন্দনীয় নয় যে, রাত্রি যাপন করি নামাজে আর দিনের বেলায় তা নিয়ে গর্ব করে বেড়াই।

একটি সূক্ষ্মতম নম্রতা

হযরত মু'তারিফ বলতেন -আয় আল্লাহ! আপনি অমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। নতুবা অমাদের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দিন। কেননা অনেক সময় মনিব তার ক্রীতদাসের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন অথচ মনিব তার প্রতি অসন্তুষ্ট ।

দায়িত্ব পালন ইখ্‌লাছের পরিপন্থী নয়

হযরত মু'তারিফের দেখমতে জনৈক ব্যক্তি আরয করল –যে ব্যক্তি কারো জানাযায় এই জন্য অংশ গ্রহণ করে যে মৃতের উত্তরাধিকারীগণের কাছে যেন সে লজ্জা না পায়। অর্থাৎ যে অংশ গ্রহণকারী জীবিতদের খুশী করার উদ্দেশ্যে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির সওয়াব হবে কি? হযরত বলেলেন–এ মাসালা বিখ্যাত মোহাদ্দিস ইবনে মুহাম্মদ সীরীনের রায় হচ্ছে অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য রয়েছে দ্বিমুখী প্রতিদান। একটি হল স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের জানাযার নামাজ আদায় করার কারণে। দ্বিতীয়টি হল; মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মন খুশীর জন্য জানায়ার সাথে চলার কারণে।

ইমাম মুহম্মাদ ইবনে সীরীণ (রহঃ) –এ বাণীঃ

পথ যাত্রা কালে কাউকে নিজের সাথে চলতে না দেয়া

ইমাম মুহাম্মদ সীরীন (রহঃ) নিজের সাথে পথ যাত্রাকলে কাউকে চলতে দিতেন না। বরং তিনি বলে দিতেন, তোমাদের কারো যদি আমার সাথে তেমন প্রয়োজন না থাকে তাহলে ফিরে যাও।

জাগ্রত অবস্থা ঠিক হলে স্বপ্ন ক্ষতির কারণ হয় না

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীণ (রহঃ)–এর খেদমতে কোন ভয়ানক স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি উত্তর দিতেন, জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ্ তালাকে ভয় কর। তাহলে তিনি স্বপ্নে যা দেখেছ তা তোমার কোন ক্ষতির কারণ হবে না।

ফায়দা ঃ কোন কোন মানুষ খারাপ স্বপ্ন দেখার কারণে মরদুদ বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার সংশয়ে লিপ্ত হয়। এতে তাদের সে ধারণার সংশোধন করে দেন।

একটি সূক্ষ্মতম আদব

এক ব্যক্তি তার খেদমতে আবেদন করল, আমি আপনার গীবত করে ফেলেছি। আপনি অমাকে মোবাহ্ করে দিন। অর্থাৎ ক্ষমা করে দিন।

মোবহ্ শব্দটি আবেদনকারী পরিভাষার অনুকুলে ব্যবহার করে ছিল। তিনি উত্তর' দিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা যেই মিস্কিনের সন্মান হানিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছন আমি তা মোবাহ্ করাকে কিভাবে পছন্দ করতে পারি ? হ্যাঁ তবে আমি দোয়া করছি আল্লাহ্ পাক তোমাকে ক্ষমা করুন।

ফায়দা ঃ সন্দেহযুক্ত শব্দের ব্যবহার করা উচিত নয়।

হযরত ইউনুস ইবনে উবায়দের বাণীঃ
প্রতিটি আমলকে নিজের সামর্থে রাখা সম্পর্কে ঃ

একদা তিনি বলেন, এ উম্মতের মধ্যে রিয়া এবং কিবর কোনটাই নির্ভেজাল ভাবে পাওয়া যায় না। আরয করা হল এটি আবার কেমন করে? তিনি উত্তর দিলেন, সিজদার সাথে নির্ভেজাল কিব্র এবং তাওহীদের সাথে নির্ভেজাল রিয়া একত্রিত হতে পারে না।

উপরোক্ত বাণীর সার–সংক্ষেপ হল সিজ্দা উচ্চতর তাওয়ায়ু আর তাওহীদ উচ্চস্তরের ইখ্লাছ। তাই এই দুইটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারীকে পুরো মুতাকাব্বির এবং পুরো রিয়য়াকারী আখ্যা দেয়া যায় না।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসায়ের বাণীঃ

কথা বললে অপছন্দীয় হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে নীরব থাকাই উত্তম

হযরত মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি'ক (রহঃ) কম্বল পরিহিত থাকতেন। একদা তিনি কুতায়বা ইব্নে সায়ীদ (রহঃ)–এ খেদমতে গমন করলেন। হযরত কুতায়বা তাঁকে জিজ্ঞেস, করলেন আপনি কম্বল পরিধান করছেন কেন ? তিনি কিছু না বলে নীরব থাকলে হযরত কুতায়বা পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করলাম আপনি জওয়াব দিচ্ছেন না কেন ? তিনি আরজ করলেন, আমি অপনার প্রশ্নের উত্তরে যদি বলতে যাই, আমি যাহেদ দুনিয়ার প্রতি অনিহা ভাবাপন্ন, তখন এটি আমার নিজের প্রশংসা এবং বাতেনী পবিত্রতার বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু হবে না। আর

যদি বলতে যাই আমি দরিদ্র ও সর্বহারা, তখন হবে এটি আমার পক্ষ থেকে আল্লাহপাক পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা। এই জন্যেই আমি উত্তর না দিয়ে খামুশ রয়েছি।

ফায়দা ঃ কেননা আমি যদি এই উত্তর দিতে যাই যে, আমার অন্য কোন প্রকারের পোশাক প্রস্তুত ছিল না বিধায় কম্বল পরিধান করছি, তখন এটি স্বীয় দারিদ্র প্রকাশ করার নামান্তর হবে। আর যদি বলি স্বচ্ছলতা থাকা সত্বেও এমনটি পরিধান করে এসেছি। তখন দুনিয়ার প্রতি অনিহা প্রকাশের নামান্তর হবে। অথচ উভয়টিই অপছন্দনীয়। আর এটি পরিধান করা শুধু এই জন্য দোষনীয় হবে না যেহেতু সম্ভবানা রয়েছে শুন্য মনেও তা পরিধান করা। এদিকে শূন্য মনের উত্তর দেয়ায় মিথ্যের সন্দেহ বিরাজমান। যেহেতু এই সম্ভাবন ও তো আছে। অন্তরে উল্লেখিত দু'টি দিকের কোন একটির আকর্ষণ বিদ্যমান থাকা।

হযরত মুহম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজী (রহঃ) –এ বাণীঃ গোনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলই প্রকৃত পাথেয় ঃ

তাঁর খিদমতে এক ব্যক্তি একথা জানতে চাইল, আমি যদি আল্লাহর সাথে গুনাহ্ না করার চুক্তিবদ্ধ হই, এটি কেমন হবে ? তিনি জওয়াব দিলেন, এমন অবস্থায় তোমার চেয়ে গুনাহ্গার আর কে হবে ? কারণ তুমি আল্লাহর ব্যাপারে এ কছম করেছো (চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া কছমেরই অন্তর্ভূক্ত) যে, তিনি তোমার ব্যপারে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্ত জারী করেন না।

ফায়দা ঃ এ জাতীয় চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি কসমেরই নামান্তর যে, আল্লাহপাক তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। এখানে এ সন্দেহেরও যে অবকাশ নেই। অথচ আল্লাহ পাকের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় সম্পর্কে সামান্য ইলমও কারো নাই। এমনই যদি হয় তাহলে স্বীয় নাফ্সের উপর এতটুকু আস্থা কিভাবে রাখা সম্ভব ? বরঞ্চ এ জাতীয় ক্ষেত্রে আদব এই যে, আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের হিফাজত এবং গুনাহর দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য দোয়া করতে থাকা।

বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা কমানো

মুহাম্মদ ইব্নে কা'ব কুরাজী (রহঃ) সচারাচর বলে থাকতেন, বন্ধু –বান্ধবের সংখ্যা তোমরা বাড়াবে না এজন্য যে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দায়িত্বের বোঝাও তোমাদের উপর বর্তাবে অধিক পরিমাণে। ফলে তখন তোমরা অক্ষম হয়ে যাবে। আমি আল্লাহর কছম করে বলছি, আমি তো একজনের ওয়াজিব হকও যথাযথ ভাবে আদায় করতে সক্ষম নই।

ফায়দা ঃ আস্‌হাব, (শিষ্য–বন্ধু), শব্দটি ছাত্র, মুরীদ ও বন্ধুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। হুকুম একই। এদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা দ্বীনী ফায়দা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। বরং এ নিষেধাজ্ঞা বিশেষ সম্পর্কের বেলায় ।

হযরত উবাইদাহ ইব্নে উমায়র (রহঃ) –এর বাণীঃ দুনিয়া বর্জনের সুন্নত সম্মত সীমা

হযরত উবাইদাহ (রহঃ) বলতেন , দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কম রাখার পরিমাণ হচ্ছে, মানুষ এমন এক দরজায় উপনীত হওয়া যে, গুনাহে পুনরায় লিপ্ত না হয়।

হযরত আতাইবনে রিবাহের চারিত্রতক বৈশিষ্ট্য ঃ কারো কথা শুনার আদবঃ

তাঁর অভ্যাস ছিল যে, কেউ তাঁর কাছে এমন ঘটনা বা কাহিনী যখন শুনাতো, যা তাঁর আগেই জানা আছে তখন তিনি এমন একাগ্র চিত্তে তা শুনতেন-ইতিপুর্বে তিনি যেন কথাটি শুনেন নাই । উদ্দেশ্য বর্ণনাকারী যেন লজ্জিত হয়ে না যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে ওয়াহাব ইব্নে মুনাব্বিহ (রহঃ)-এর বাণীঃ ভদ্রতা ও অভদ্রতার কোন কোন নিদর্শন ঃ

তিনি বলতেন ঃ ভদ্র মানুষ ইল্ম হাসিল করলে চারিত্রিক ভাবে সে বিনয়ী ও অমায়িক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে নীচ জাতের লোক ইল্ম হাসিল করলে দাম্ভিক ও অহংকারী হয়ে যায়।

৫—

দারিদ্রের নিদর্শন

তিনি বলতেন, যদি কোন মানুষ দরিদ্র ও অবস্থাহীন হয়ে যায়, তখন সাধারণত ঃ দেখা যায় তার দ্বীনি অবস্থারও অবনতি ঘটে। আমলে হয়ে পড়ে মন্থর। হ্রাস পায় তার মর্যাদা। মানুষ তাকে নিঃস্ব ও হীন মনে করে।

ফায়দা ঃ দারিদ্র ও অভাবের তাড়নায় কখনো ধৈর্যহারা হওয়ার কারণে তাকে এহেন বিপর্যস্থ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এক হাদীসে এমনও বর্ণিত হয়েছে যে, দারিদ্র কখনো মানুষকে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। যদ্দরুন আঁ হযরত (সঃ) এ জাতীয় দারিদ্র ও অভাব থেকে পানাহ চেয়েছেন। আর যে সব হাদীসে দারিদ্রের মান ও ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে বস্তুতঃ তা সে সময়ের অবস্থা যখন ধৈর্য ধারণে সক্ষম হয় এবং সে এ ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন না হয়। কোন কোন হাদীসে নবী (সঃ) মিস্কীন বা গরীব হয়ে থাকার জন্য দোয়া বা প্রার্থনার কথা এসেছে। তার অর্থ মিসকীনদের ন্যায় জীবন যাপন করা। এ মিসকীন দ্বারা পরমুখাপেক্ষিতা ও ভিক্ষুক হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

হযরত ইবরাহীম তাইমীর অবস্থা ঃ

বিনা আহারে দীর্ঘ দিন কাটানো ঃ

ইমাম আ'মাশ বলেন, আমি একদা ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) এর খিদমতে আরয করলাম আমি শুনেছি আপনি এক এক মাস অতিবাহিত করেন অথচ কিছুই আহার করেন না। তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, এমনটি হয়। এমনকি দুই মাসেও খাদ্য গ্রহণ করিনি। শুধু একটি মাত্র আঙ্গুর আমার পরিবারের পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল কেবল তাই একটু মুখে রেখে দিয়ে ছিলাম, তাও হঠাৎ আমার মুখ থেকে নিক্ষেপ করে দেই।

ফায়দা ঃ অধিক যিকির ও ফিকিরের এই হল স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। আর যদি কখনো ইহা সীমা অতিক্রম করে যায়। তাহলে ধরে নিতে হবে এটি কারামত। আবার তিনি নিজে তা প্রকাশ করেছেন বলে দ্বিধায় পড়া

সমীচীন হবে না। দ্বীনী কোন হিতার্থে তা করা যেতে পারে। আর তা না হলেও আপনজনদের কাছে বলায় এমন কিছু আসে যায় না। যেহেতু তাতে ফেতনার কোন আশংকা নাই।

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) –এর বাণীঃ

রোগের কথা প্রকাশে অসুবিধ নেই

তিনি বলেন, কোন রোগীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কেমন আছেন ? প্রথমত ঃ উত্তর দেবে ভাল আছি এরপর রোগ শোকের অবস্থা বর্ণনা করবে।

ফায়দা ঃ মানুষ যত কষ্ট এবং রোগেই থাকুক না কেন, তার উপর তখনও রয়েছে আল্লাহ পাকের অসীম দয়া ও নেয়ামত। তাহলে এটি ন্যায়সঙ্গত হবে না। শুধুরোগ শোকই ব্যক্ত করবে। অথচ শান্তি ও নেয়ামতের কথা ছেড়ে দেবে ? অনুরূপ এটিও বান্দাহার দাসত্বের পরিপন্থী হবে যদি রোগ-শোকের কথা একবারে উল্লেখই না করে। কেননা এতে স্বীয় শক্তির দাবী প্রচ্ছন্ন থাকে। অমাদের পূর্বসূরী আকাবিরগণকে আল্লাহ পাক এমন অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে ছিলেন যে, তাঁরা প্রতিটি সময় ও অবস্থার যথাযথ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এই জন্য রোগ শোকের অবস্থায়ও আল্লাহর প্রদত্ত নেয়ামতে শোকর আদায় করা এবং পরে রোগ শোক সম্পর্কে আলোচনার শিক্ষা দিয়ে ছিলেন।

ইলমের বিপর্যয় থেকে বাঁচার বর্ণনা ঃ

তিনি আরো বলতেন, ইলমের বিপদের প্রতি লক্ষ্য করলে আমার মনে এ কথাই জাগে, হয় যদি আমি এ যাবত কোন ইলমী আলোচনায় কোন বক্তব্যই না রাখতাম (কত ভালো হত)। আর যে যুগে আমার ন্যায় একজন লোককে ফকীহ আখ্যা দেয়া হয়, তার চেয়ে খারাপ যুগ আর একটিও হতে পারে না।

তাকোয়ার নজীরহীন দৃষ্টান্ত

ইবরাহীম নাখয়ী (রহঃ) সওয়ার হওয়ার জন্য কোন জন্তু ভাড়া নিলে যদি ঘটনাক্রমে কোথাও তাঁর চাবুক ইত্যাদি পড়ে যেতো, আর তা উঠিয়ে নেয়ার জন্য তাঁর পেছনে যাওয়ার দরকার হত, তখন তিনি জন্তুর উপর সওয়ার হয়ে পেছনে যেতেন না। বরং জন্তু থেকে অবতরণ করে পায়ে হেঁটে যেতেন। এর কারণ হিসাবে বলতেন, মালিক হতে আমি জন্তুটি ভাড়া নিয়েছি সমানে যাওয়ার কথা বলে তা নিয়ে পেছনে যাওয়ার কথা হয়নি। তখন এজন্য সওয়ার হয়ে পেছনে যাওয়াটা মালিকের হক নষ্ট করার শামিল।

হযরত আওন ইব্‌নে আবদুল্লাহ ইব্‌নে উত্‌বার বাণীঃ

মজলিসে উপস্থিত লোকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা

তাঁর এ অভ্যাস ছিল, কখনো উচ্চমানের পোশাক পরিরধান করতেন এবং কখনো পশমী নিম্নমানের। তাঁর খিদ্‌মতে এ রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন,আমার কাছে প্রভাব প্রতিপত্তিশালীগণ ইলম হাসিল করার জন্য আসতে যেন সংকোচ বোধ না করেন, এ জন্যই আমি কখনো পরিধান করি উচ্চমানের পোশাক। আর কখানো সাধারণ ছদ্মবেশী পোশাক পরি। অভাবী গরীব লোকরা যেন আমার নিকট থাকতে বসতে ভীত প্রভাবিত হয়ে না পড়ে।

হযরত সায়ীদ ইব্‌নে জুবায়র (রহঃ) – এর বাণী ঃ

কারণ বশত ঃ অন্যায় থেকে বিরত থাকার আহ্বান না করা

তিনি বলতেন, সময়ে কোন লোককে গুনাহ্‌র অবস্থায় দেখা সত্ত্বেও তাকে নিষেধ করতে আমি লজ্জাবোধ করি। আর তা এ জন্য, আমি নিজেই অগণিত গুনায় আচ্ছন্ন আছি, তাহলে আমার চেয়ে উত্তম এক জনের উপর কি করে হুকুম চালাব ?

ফায়দা ঃ নিজকে অত্যধিক হীন মনে করার কারণে কদাচিৎ তা করা যেতে পারে। প্রকারান্তরে উচিৎ হবে নম্রভাবে তাকে নছিহত করা এবং এ থেকে বিরত না থাকা।

যিকিরের আসল হাকীকত

যিনি বলেন, আল্লাহর হুকুমের যে যথারীতি তাবেদারী করবে, আসলে সেই হবে যিকিরকারী। তাবেদারীর না করলে, যিকিরকারী হবে না। (মৌখিক যিকির মূলতঃ যিকির নয়) যদিও তাসবীহ্ এবং কুরআন তিলাওয়াত সে অধিক পরিমাণেই করুক না কেন?

ফায়দা ঃ উপরোক্ত বাণীর অর্থ তার যিকিরের কোন মূল্য নাই এমনটি নয়। বরং আসল কথা হল ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহর হুকুমের তাবেদারী করা। তা হওয়ার পর যিকির মৌখিকভাবে হলেও তেমন অসুবিধা নেই। এদিকে বাস্তাব আমল না থাকলে বেশী বেশী যিকিরে তেমন ফায়দাও নাই।

ইলমের বিপদ হতে নিষ্কৃতি সম্পর্কে (১)

(যখন ওলামাদের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করতেন এবং ভীতকাতর হয়ে পড়তেন তখন) বলতেন, কতই না ভাল হত, যদি আমি ইল্‌ম আদৌ না শিখতাম! কতই না ভাল হত যদি আমি দুনিয়া হতে স্বাভাবিক ভাবে চলে যেতে পারতাম। আর এ ইলমের খেদমতের সওয়াব না পেতাম কিংবা এ শাস্তিরও যোগ্য না হতাম।

ফায়দা ঃ উল্লেখিত বাণীতে আমলের জন্য যতটুকু ইলম অপরিহার্য হয়, তা উদ্দেশ্য নয়। বরং তাবলীগী ইলম উদ্দেশ্য। অপরিহার্য ইলমের উর্ধ্বের ইলম সম্পর্কেই তাঁর এ উক্তি প্রযোজ্য হবে।

হযরত মাহান ইব্‌নে কায়সের বাণী ঃ

জাহেরের উপর বাতিনের প্রাধান্য

তাঁর খিদমতে হযরত সুফীয়ায়ে কিরামের আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, তাঁদের আমলের পরিমাণে ছিল কম। কিন্তু

(১) টীকা ঃ এ প্রসঙ্গটি একটু পূর্বেও একবার বর্ণিত হয়েছে।

তাঁদের অন্তর ছিল যাবতীয় পঙ্কিলতা হতে পবিত্র। যদ্দরুণ তাঁদের স্বল্প আমলই আমাদের অধিক আমলের অপেক্ষা উচ্চমানের ও মর্যাদাশালী ছিল।

হযরত তালহা ইবনে মুসাররিফের কিছু হালাত। লোকেরা বড় মনে করার প্রতিকার

তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, লোকজন সমসাময়িক কারো চেয়ে তাঁকে বড় কিংবা উত্তম মনে করলে তিনি তাঁর মজলিসে হাজির হয়ে যেতেন এবং তাঁর কাছে কিতাব পড়ে নিতেন। বসতেন তাঁর একজন শাগরিদের মত হয়ে। উদ্দেশ্য মানুষের মন থেকে তাঁকে বড় মনে করার কল্পনা দূর করে দেয়া।

হযরত উয়াইস খাওলানীর অবস্থা নাফ্ছকে কষ্ট দিয়ে শায়েস্তা করা

যদি কখনো তাঁর আমলে অলসতা দেখা দিত, তখন তিনি স্বীয় পায়ের গোছায় চাবুক মেরে নিজেকে শায়েস্তা করতেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে উমার আওযায়ীর অবস্থা জীব- জন্তুরপ্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করা

বন্য পশুরা যখন বাচ্চা প্রসব করতো, ইমাম আওযায়ী (রহঃ) তখন ওগুলো শিকার করা পছন্দ করতেন না। (কেননা মা শিকার করা হলে বাচ্চাগুলো আশ্রয় হারা হয়ে যাবে, আর ছানা শিকার করা হলে মা কষ্টে নিপতিত হবে।)

হযরত হাসসান ইবনে উৎবার অবস্থা আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ার জন্য সময় নির্দ্ধারণ করে নেয়া

তাঁর অভ্যাস ছিল, আছরের নামায আদায় করে মসজিদের এক কোণে পৃথক হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহ্র জিকিরে একাকী নিমগ্ন থাকতেন।

হযরত আবদুল ওয়াহিদ ইব্নে যায়েদের বাণীঃ অপারগ অবস্থায় আকাংখা পরিহার করা

তিনি বলতেন আল্লাহ্র ফায়সলায় সন্তুষ্ট থাকাটা-ই হচ্ছে বান্দাহ্র জন্য সর্বোত্তম অবস্থা। আল্লাহ পাক যদি তাকে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করার জন্য দুনিয়ায় বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে এটিকে শ্রেয় মনে করা উচিৎ। আর যদি তাকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে চান, এটির উপর রাযী থাকা উচিৎ। কবি কি সুন্দর ভাবেই বলেছেন –

نہ کوئی ھجربرا اورنہ وصال اچھا ھے

یارجس حال میں رکھے وہی حال اچھاھے –

“বিচ্ছেদ আমার কভু কাম্য নয়, মিলনে আবার নই অভিলাষী’
বন্ধু আমাকে যেভাবেই রাখুক আমি শুধু তারই প্রত্যাশী।”
কবি আরিফ শিরাযী বলেন–

فراق ووصال چہ باشد رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد از و غیر اوتمنا ئے

“বিরহ মিলন এ–তো কিছু নয় দোস্তের খুশীর সন্ধানে থাক,
পরিতাপ কিন্তু জীবনটিতে তোমার, যদি তাকে বিনে কোন ভাব রাখ।”
একই মর্মে কণ্ঠ রেখে দার্শনিক কবি আল্লাম রুমী বলেন–

چونکہ بر میخت بہ بند دبستہ باش –

چون کشاید چابك وبر جستہ باش

তোমাকে যখন পেরেকে বাঁধা হয়
এতেই আবদ্ধ রও,
ছেড়ে দিলে আবার বিলম্ব করোনা
শীঘ্রই দৌঁড়ে যাও।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) –এর বাণীঃ

তালিবে ইলমদের বাহ্যিক স্বাবলম্বিতার রহস্য

তিনি বলতেন, আমার মনটা চায় তালিবে ইলমদের কাছে প্রয়োজন অনুযায়ী মাল থাকুক। কারণ তারা যখন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়, তখন নানা ধরনের বিপদ এবং মানুষের তিরস্কার ও কটাক্ষের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রয়োজন বশত ঃ রোগের কথা প্রকাশ করা ছবরের পরিপন্থী নয় ঃ

তিনি বলতেন, রোগী যদি প্রয়োজন বশতঃ নিজের কোন আপন জনের কাছে স্বীয় কষ্টের কথা প্রকাশ করে তাহলে এটি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে না, যা নিন্দিত।

জীবিকার প্রাচুর্য এবং স্বচ্ছলতা লাভ করা

তিনি বলছেন, যখন তোমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, অমুক বস্তিতে দ্রব্য সুলভে পাওয়া যায় এবং সেখানে জীবিকার প্রাচুর্য আছে এমতাবস্থায় প্রয়োজন মনে করলে সেখানে চলে যাও।

কেননা সেখানকার বসবাস তোমার অন্তর এবং দ্বীনের জন্য অধিকতর নিরাপদ এবং কল্যাণকর হবে। তিনি আরো বলেছেন, আমার এন্তেকালের পর দশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার একটি স্তুপ উত্তরাধিকার স্বত্ব হিসেবে ছেড়ে যাওয়াটা মানুষের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা ধরার অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কিয়ামতের দিন যদিও আমাকে ওগুলোর হিসাব কিতাব দিতে হয়। আর কারণ হচ্ছে, আগের যমানায় মাল অপছন্দনীয় বস্তু মনে করা হত। কিন্তু আজকাল তা মুসলমানের জন্য আত্মরক্ষার উপকরণ স্বরূপ যা মুসলমানকে বাদশা এবং আমীরদের সম্মুখে ভিক্ষার হাত বাড়ানো হতে হেফাজত করে।

দান করার পর যে বলে বেড়ায় তার হাদিয়া গ্রহণ না করা

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-কে হাদিয়া প্রদান করা হলে অনেক সময় তিনি তা গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করতেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যাখ্যান

করে দিতেন এমন ব্যক্তির হাদিয়া, যার সম্পর্কে এ ধারণা হত হাদিয়া দেয়ার পর সে গর্ব করবে এবং চর্চা করে বেড়াবে। এই ব্যাখ্যারে প্রমাণ হচ্ছে হযরত সুফিয়ান (রহঃ) এ নিম্নোক্ত উক্তি–যদি নিশ্চিত ভাবে জানতাম তারা হাদিয়া দেয়ার পর ফখর করবে না, চর্চা করে বেড়াবে না, তাহলে তাদের অনুদানসমূহ আমি গ্রহণ করে নিতাম।

আপোষকামিতার নিদর্শন

তিনি বলতেন, বন্ধুর আধিক্য দ্বীনের দুর্বলতা অর্থাৎ সত্যের আহ্বানে স্বার্থপরয়াণতা এবং নমনীয়তার জ্বলন্ত নিদর্শন ।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, সাধারণত ঃ দ্বীন সম্পর্কে যে ব্যক্তি আপোষহীন ভূমিকা রাখবে, মানুষ তার প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে যাবে, ফলে তার বন্ধুর সংখ্যার ধীরে ধীরে ভাটা পড়তে থাকে।

কোন কোন সময় মানুষের থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে আপন কর্তব্যে মনোনিবেশ করা মঙ্গলজনক

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, বর্তমান সময়টি এমন, একটি সময় যখন শুধু স্বীয় দ্বীনের সংরক্ষেণের চিন্তায় মনোনিবেশ করা উচিত। অন্যদের ইছলাহ বা সংশোধনের চিন্তায় লিপ্ত হওয়া অহেতুক কাজ। বরং তাদেরকে তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত। হযরত মুফতি শফী ছাহেব (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, উপরোক্ত উক্তি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অভিজ্ঞতার দ্বারা সাব্যস্ত হবে যে, এ মুহূর্তে ওয়াজ নছীহত লাভজনক হচ্ছে না।

প্রয়োজন বশতঃ কোন কোন আমলের চেয়ে

পরিবারের হক প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য ঃ

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ)– এর খিদ্‌মতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এক ব্যক্তিকে তাঁর পরিবার–পরিজনের ভরণ–পোষণের উদ্দেশ্য আয় উপার্জনে থাকতে হয়। এমতাবস্থায় সে যদি জামায়াতে নামায় পড়াকে অনিবার্য ও অপরিত্যাজ্য রাখতে যায়, তাহলে জীবিকার উপার্জনে বিরাট

ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এখন তার কর্তব্য কি হবে ? হযরত সুফিয়ান (রহঃ) এর উত্তরে বললেন, প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন করে পরে সে একা একা নামাজ আদায় করে নিতে পারে।

ফায়দা ঃ আলোচ্য উক্তি তখনই কার্যকর হবে, যখন কেউ যথার্থ গ্রহণযোগ্য কোন অপারগতার সন্মুখীন হয় ।

বিদয়াতপন্থী বা গোমরাহ্ লোকদের মতামত

প্রয়োজন ব্যতিরেকে চর্চা করা ক্ষতিকর

হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) এ কথা একাধিক বার বলেছেন যে, কোন বিদয়াত কিংবা কোন গোমরাহীর কথা শুনলে তোমরা আপনদের কাছে তা চর্চা বা বর্ণনা করতে যেয়ো না। কারণ হতে পারে, এ দরুন শ্রোতার অন্তরে কোন প্রকার দ্বিধা – সংশয় সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)–এ বাণী ঃ

নিজের দিকে ইলম সম্বন্ধ করার পথ থেকে বিরত থাকা সম্পর্কে

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেছেন মন চায় জগতবাসী আমার কাছে থেকে দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করুক, কিন্তু আমার দিকে একটি অক্ষরের ইশারা বা নিস্‌বত না হোক। সম্পৃক্তির কারণে মানুষ অগণিত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বিপদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

আলিমের জন্য সুনির্দ্ধারিত অজিফা পালনের আবশ্যকতা

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) আরো বলেন, একজন আলিমের জন্য কিছু স্বতন্ত্র অযিফা থাকা আবশ্যক। যেন মহান আল্লাহর সাথে তার গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর তাতে মাখলূকের সাথে কোন প্রকার যোগ থাকবে না। উপরোক্ত উক্তির মর্ম হচ্ছে, ইলুমের দ্বারা মানুষে উপকার করা ইবাদত বটে, কিন্তু তা পরোক্ষ ইবাদত যেহেতু ইহা ইবাদতে পরিণত হয়

মানুষেরই মাধ্যমে, তাই আলিমের জন্য প্রত্যক্ষ ও সরাসরি কিছু বিশেষ নফল ইবাদত গ্রহণ করে নেয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা প্রত্যেক ইবাদতের ধরণ বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন এবং তার নূর ও গুনাগুণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। তাই কোনটার থেকেই বঞ্চিত হওয়া সঙ্গত নয়।

মানুষের সাথে মেলামেশা এবং সম্পর্কচ্যুতির ভারসাম্যতা

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন, মানুষের সাথে অধিক সম্পর্ক এবং হাসি তামাশা অসৎ বন্ধু জোটার কারণ হয়। আবার মানুষদের সাথে পুরো সম্পর্কচ্যুতিও ঠিক নয়। তাতে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এজন্যই উচিৎ হবে অত্যধিক সম্পর্ক এবং সম্পর্কচ্যুতির মাঝখানে সমতা ও ভারসাম্যতা রক্ষা করা।

অনুভূতিহীনতা এবং পাষাণ হৃদয় হওয়ার নিন্দা সম্পর্কে

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন, কারো সাথে রাগের কোন ব্যবহার দেখালে অর্থাৎ এমন আচরণ যদি করা হয়, যদ্দরুণ স্বভাবতঃ মানুষ মাত্রই ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে, তারপর যদি তার ক্রোধ না আসে, তাহলে ভেবে নিতে হবে একটি গাধা। কেননা এটি অনুভূতি হীনও আত্মমর্যাদাহীন হওয়ার লক্ষণ। আবার কারো কাছে শত অনুকম্পা প্রার্থী হলেও যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে ধরে নিতে হবে সে একটি শয়তান।

হযরত ইমাম মালিক (রাহঃ) এর বাণীঃ

ইল্‌মের হাকীকত ঃ

তিনি বলেন, অত্যধিক বর্ণনার নাম ইল্‌ম নয়। মূলতঃ ইল্‌ম খোদা প্রদত্ত একটা নূর। যা আল্লাহ্ পাক মানুষের কলবে প্রদান করে থাকেন।

অপমানের হাত থেকে ইল্‌মকে হিফাজত করা

ইমাম মালিক (রাহঃ) বলতেন, একজন আলিমের জন্য কখনো সমীচীন হবে না যে, সাধারণ জন-সমাবেশে ইল্‌ম ও উপদেশ করতে যাওয়া, যারা তার কথার প্রতি মনোয়োগ না দেয়। কেননা এতে ইল্‌মের

অসন্মান এবং তার ব্যক্তিগত সম্ভ্রমহীন বৈ কিছু হবে না। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) এর বিশ্লেষণে বলেন, প্রয়োজনীয় তাবলীগ আলোচ্য বক্তব্যের বাইরে। কেননা প্রয়োজনীয় তাবলীগের প্রচার প্রকাশনা বাধ্যতামূলক করণীয়। কেউ শুনুক আর না-ই শুনুক। মানুক আর না-ই মানুক। এরই প্রেক্ষিতে নবী (সাঃ)-এর আচরণ কাফিরকুলের সাথে তাবলীগের ব্যাপারে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) –এর বাণীঃ বুজুর্গগণের আদবে সূক্ষ্মদৃষ্টি

হযরত ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহঃ) এর খিদমেত আরজ করা হয়ে ছিল যে, প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আলকামা (রহঃ) এবং হযরত আস্ওয়াদ (রাঃ)–এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? জওয়াবে ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহর কসম আমরা তো সে সকল মণীষীর নাম নেয়ারও যোগ্য নই। তাই পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের জরীপ দেয়া আমাদের যোগ্যতার বহু উর্ধ্বের বিষয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) –এর অবস্থা ও উক্তি

স্বভাবগত কারণে কিংবা নম্রতার ফলে মানসিক অস্বস্তির কারণ হয় বিধায় কাউকে নিয়ে পথ না চলা ঃ

তাঁর চিরাচরিত এ অভ্যাস ছিল। যখন তিনি কোথাও বের হতে চাইতেন, কাউকে তখন তাঁর সাথে চলতে দিতেন না। হয়তো সেটি এ কারণে যে, প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে চলা চারিত্রিক কোমলতার পরিপন্থী এবং মানসিক অস্বস্তির কারণে কিংবা ব্যক্তিগত বিনয়ের ফলে তা অপছন্দীয় ছিল বিধায় ।

প্রয়োজনের মাত্রা অনুযায়ী দুনিয়ার সম্পদ তালাশ করার অনুমতি

ইমাম আহ্মদ ইব্নে হাম্বল (রহঃ) বলতেন, প্রয়োজনের মাত্রা অনুপাতে দুনিয়ার সম্পদ সন্ধান করা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার শামিল নয়।

হযরত মুসইর কুদাম (রহঃ)–এর অবস্থা ও মর্যাদা কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া বুযুর্গী এবং বিলায়াতের খেলাপ নয় ঃ

তাঁর খিদমতে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কি পছন্দ করেন যে,মানুষ অপনাকে আপনার ত্রুটিসমুহ চিহ্নিত করে দিক। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ কেউ যদি মঙ্গল কামনা করে আমাকে অবহিত করে দেয় তাহলে আমি সুখী হব, আর যদি, আমাকে হেয় এবং অসন্মানী করার হীন চক্রান্তে হয়, তাহলে তা পছন্দনীয় নয়।

প্রয়োজনে রোগের কথা ব্যক্ত করা বৈধ

হযরত মুসইর বলতেন, অরিফগণ চিকিৎসকের কাছে নিজস্ব রোগের কথা ব্যক্ত করা তাঁর পালনকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্থ হবে না। বরং এ কথাই প্রমাণিত হবে, আল্লাহ্ তাআ'লা আমার উপর সার্বিক ক্ষমতাশীল এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। আর আমি সে মহান সত্বার সামনে দুর্বল ও অক্ষম।

পার্থিব স্বার্থে হাদীস শিক্ষা দেয়া এবং ফতোয়া প্রদান করা কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ

হযরত মুসইর (রহঃ) –কে কেউ যদি অসহনীয় কষ্ট দিত, তখন তিনি এই বলে বদদোয়া করতেন যে, আল্লাহ্ তাআ'লা তোমাকে মুহাদ্দিস অথবা মুফতি বানিয়ে দেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে মুহাদ্দিস কিংবা মুফতী মনোনীত করুন। এখানে সে মুহাদ্দিস এবং মুফতীর কথা বলা হয়নি যিনি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় হাদীসের তালিম দেন এবং ফতুওয়া প্রদানে আত্মনিয়োগ করে আছেন। কেননা তাদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) –এর অবস্থা এবং মর্যাদা সম্পর্কে

জনসেবা আধ্যাত্মিক সাধনার তুলনায় অধিকতর শ্রেয় ঃ

একদা তার সন্মুখে বিশ্ববরেণ্য মোহাদ্দিস হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, তোমরা আমার

কাছে এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের নাম উল্লেখ করেছ, যার পবিত্র নামের বরকতে আরোগ্য লাভ হয়। কিন্তু যদি সমস্ত মুসলমান তাঁরই পদাংক অনুসরণে নিজস্ব জীবন ধারা গ্রহণ করে, তখন রাছুলুল্লাহ (সঃ) – এর অন্যান্য সুন্নত সমূহ, যথা রোগীদের পরিচর্যা জানাযার নামাজ এবং এ জাতীয় অন্যান্য আমলগুলো আদায় করার কে থাকবে ? আলোচ্য উক্তির সারমর্ম হচ্ছে এসব ছুন্নতের উপর আমল করা ইবাদতে মুজাহাদা ও সাধনা করা অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। উদ্দেশ্য সেই মুজাহাদা যা চরম পর্যায়ের। তা নাহলে মধ্যম প্রকৃতির মুজাহাদা প্রয়োজনীয় বিষয়, যার সাথে বর্ণিত আমল সমূহের সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত (রহঃ) –এর উক্তি

বিপদ থেকে বাঁচার প্রচেষ্টায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা উচিত, চরম পন্থা সমীচীন নয় ঃ

তিনি বলতেন, আমার মতে কেউ আপতিতঃ বিপদ হতে পলায়নের চেষ্টা করলে তার চেয়েও চরম বিপদে সে গ্রেফতার হয়ে যায়। এই জন্য তোমাদের করণীয় হবে ছবর অবলম্বন করা। ফলে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর দয়ায় বিপদ দূর করে দেবেন। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এখানে এমন বিপদ উদ্দেশ্য, যা করা দুষ্কর এবং তা আয়ত্বের বাইরে। অন্যথায় বিপদ হতে সাধ্যনুযায়ী বাঁচার চেষ্টা করা ছুন্নত ।

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহঃ) –এর বাণীঃ

নিমগ্ন না হয়ে পার্থিব সম্পদ তলব কর জায়েয

তিনি বলতেন, প্রয়োজন অনুপাতে পার্থিব সম্পদ তলব করা দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার অন্তর্ভূক্ত নয়। একই মর্মে আহ্‌মদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর উক্তি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হযরত হুযাইফা মার'আশী (রহঃ)–এর বাণীঃ

কঠোর পরহেযগারী অবলম্বন করা

তিনি বলতেন যদি আমার এ সন্দেহ না হত যে, অমুক ব্যক্তির কাছে গেলে কিছু না কিছু ভান–ভঙ্গিমা দেখাতে হবে, তবে সেখানে আমি যেতাম। কিন্তু যেহেতু লোক দেখানোর আশংকা প্রবল, কাজেই আমি সেখানে হাযির হই না। আমার পক্ষ থেকে আপনারা তার প্রতি ছালাম পৌছিয়ে দিবেন।

নির্জনতায় শান্তি

হযরত হুযাইফা বলতেন লোকের সাথে মেলামেশা বর্জন করে মানুষ আপন ঘরে নির্জনে বসে থাকা অপেক্ষা উত্তম কোন নেক আমল আছে বলে আমি মনে করি না। যদি আমার সামনে কোন প্রকার বিকল্প ব্যবস্থা থাকত যদ্বারা আমি বের হওয়া থেকে পরিত্রান লাভ করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তা গ্রহণ করতাম

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহঃ) –এর বাণীঃ

মজলিশের আদব

তার শাগ্‌রেদ এবং মুরীদগণ যখন তার সামনে বসতেন, এতটুকু শান্ত ও শিষ্ট হয়ে বসতেন যে, পাখীগুলো যেন তাদের মাথায় বসে আছে। আর্থাৎ কারো মাথার উপর পাখী বসলে তা উড়ে যাওয়া যদি কাম্য না হয়, তখন যেমন সে শান্ত হয়ে নীরবে বসে থাকে, তারা এমনিভাবে বসতেন।

শিষ্টাচারিতার খেলাফ দেখলে মজলিশ থেকে বহিস্কার করার শাস্তি

মুরিদগণের মধ্য হতে জনৈক মুরিদ তার মজলিসে উপবিষ্ট থাকাবস্থায় হাসি দিলে তিনি বললেন–কেউ কেউ এলম তলবের দাবীদার হওয়া সত্বেও মজলিসে বসে হাসি দেয়। এমন ব্যক্তি আমার মজলিসে দু'মাস পর্যন্ত যে না আসে। অতএব, দু'মাসের জন্য তার মজলিসে আসা বন্ধ করে দিলেন।

হযরত মুহম্মাদ ইবনে আসলাম তুসি (রহঃ)

(মৃত ১২৬ হিঃ) – এর বাণী ঃ

'সিওয়াদে আজম' বা বৃহত্তর দলের ব্যাখ্যা

তিনি বলতেন, 'সিওয়াদে আজম' তথা বৃহত্তর দলের অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়, এ কথার প্রেক্ষাপটে লোকজন আবেদন জানাল–'সিওয়াদে আজম' কোন দলটি? উত্তরে তিনি বললেন–এটি হচ্ছে সে একজন অথবা দুই তিনজন আলেমের দল, যাঁরা রছুল (সঃ)–এর ছুন্নত তাঁর আদর্শ মন্ডিত জীবনের পুরাপুরি অনুসরণ করেন। সাধারণ মুসলমানের উদ্দেশ্য নয়। অতএব, যে ব্যক্তি এ ধরণের মাত্র দুইজন আলেমের অনুগামী হবে তারাই বড় দলের অন্তর্ভূক্ত। আর যে ব্যক্তি তাঁদের বিরোধী, সে অবশ্য বৃহত্তর দলে বিরোধী হবে।

হযরত ইব্রাহীম ইব্‌নে আদহাম (রহঃ) –এ বাণীঃ

হাদিয়া কবুল করার আদব ঃ

হযরত ইব্রাহীম ইব্‌নে আদহাম (রহঃ) অধিকাংশ সময় নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করতেন।

কাবিতার অনুবাদ–ময়লাযুক্ত লবন দিয়ে এক লোকমা খাদ্য আহার করা আমার জন্য সে সুস্বাদু ফল হতে তৃপ্তিদায়ক যা ভীমরুলে পরিপূর্ণ রয়েছে। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এমন হাদিয়া যার মধ্যে কোন প্রকার রোগ জীবাণু এবং গোপন দুষিত কিছু রয়েছে। যেমন ঐসব হাদিয়া যা প্রদান করা হয় দ্বীন, নিষ্ঠা এবং তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে। অর্থাৎ যদি এ জাতীয় হাদিয়ার আদব হল দাতার প্রতি ফিরিয়ে দেয়া। বস্তুতঃ কেবল সে ব্যক্তির হাদিয়াই গ্রহণ করার উপযোগী যার সম্পর্কে নিশ্চয়তা রয়েছে যে, সর্বাবস্থায় সে ভালবাসে। সুতরাং এই সে ফল, যা ভীমরুল হতে মুক্ত।

হযরত যননূন মিসরী (রহঃ) –এর বাণীঃ

মহিলাদের সালাম গ্রহণে অস্বীকৃতি

তাঁর খিদমতে এক ব্যক্তি আরয করল, আমার স্ত্রী আপনার কাছে সালাম বলেছে। তিনি বললেন, মহিলাদের সালাম আমাদেরকে পৌছাবে না।

ফায়দা ঃ স্থান বিশেষে তাদের সালাম গ্রহণ করা জায়েয বটে, কিন্তু গ্রহণ না করাতে অধিক সর্তকতা।

তাওয়াযূ বা নম্রতার সীমা

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলতেন লোকজনের সাথে তাওয়াযু তথা বিনম্র ব্যবহার কর । কিন্তু যে ব্যক্তি তোমাকে বিনয়ী বানাতে চায়, এবং তোমাকে দিয়ে তাওয়াযু করাতে আগ্রহী, তার সামনে মোটেই নম্র হবে না। কারণ তার এমনটি চাওয়া তাকাব্বুরী বা অহংকারেই নিদর্শন এমতাবস্থায় তার প্রতি তোমার এ বিনম্র আচরণ মূলতঃ ও কার্যতঃ তার অহংকারেই সহায়ক সাব্যস্ত হবে।

হযরত মা'রুফ কার্‌খী (রহঃ) –এর বাণীঃ

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করার বিশেষত্ব

তিনি বলতেন, কোন আলিম তাঁর ইল্‌ম মুতাবিক আমল করলে সর্বসাধারণ ঈমানদারগণের অন্তর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ সবাই তাকে ভালবাসতে থাকে। আর যাদের অন্তরে কোন প্রকার রোগ এবং ক্রুটি রয়েছে। তারা তাকে অপছন্দ করতে থাকে।

ফায়দা ঃ আমলকারী আলিম মানুষের অন্তর পরীক্ষার কষ্টিপাথর তুল্য। তাঁকে ভালবাসা স্বীয় ঈমানের নিরাপত্তা ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিচায়ক। আর তাঁর প্রতি দুশমনী রাখা ঈমানের নিরাপত্তাহীনতা ও কবুলযোগ্য না হওয়ার নিদর্শন।

৬—

আয় আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার মহব্বতের তৌফিক দিন এবং যাঁদের ভালবাসায় আমাদের মঙ্গল নিহিত তাঁদেরকে ভালবাসার তৌফিক দান করুন।

হযরত আবু নসর বিশ্‌রে হাফী (মৃত ২২৭ হিজরী)–এর বাণীঃ

কোন কোন মৃত ব্যক্তি আসলে জীবিত, আবার কোন জীবিত ব্যক্তির মুর্দা হওয়ার বর্ণনা

হযরত বিশ্‌রে হাফী (রহঃ) বলতেন, তেমাদের জন্য তাঁরাই যথেষ্ট, যারা ইনতিকাল করলে প্রাণ জীবিত হয়ে উঠে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এখানে 'যথেষ্ট' হওয়ার অর্থ হল পরে আলোচনা করা হবে এমন জীবিত লোকদের স্তরে আলোচ্য মুর্দারগণই যথেষ্ট।

আবার অনেকে এমনও আছে যে, তাদেরকে দেখলে জীবিত অন্তর পাষাণবৎ কঠোর হয়ে যায়, যা তার জন্য মরণতুল্য ।

শব্দের উপর অর্থের প্রাধান্য

হযরত বিশরে হাফী (রাহঃ) বলতেন ঃ তোমরা কাউকে চিঠি লিখতে হলে অযথা পান্ডিত্য ও অলংকার সজ্জিত করতে যেয়ো না। তার রহস্য হচ্ছে, একবার আমি একটি চিঠি লিখলাম। তারপর আমার অন্তরে জাগলো এমন একটি ভাব, তা লিখলে ভাষাগত দিক দিয়ে চিঠিখানার শ্রী বৃদ্ধি হতো। কিন্তু সে ভাবটি ছিল কিছু মিথ্যাশ্রিত। আর তা যদি পরিহার করি তখন আবার চিঠিখানার ভাষা সাধারণ মানের হয়ে যায়। তখন কিন্তু কথা থাকে সত্য। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সত্যটুকুই গ্রহণ করি।

যাতে ভাষা সাধারণ মানের হয়, কিন্তু ভাব থাকে সত্যনিষ্ঠ পরক্ষণেই বাহিরে এক কোন থেকে শুন্‌তে পাই এক হাতিফ তথা গুপ্ত ফেরেশ্‌তার বাণী– "আল্লাহ্‌পাক ঈমানদারগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সঠিক ও সত্যের উপর সুদৃঢ় রেখে থাকেন।

নিষ্প্রয়োজনীয় সম্পর্ক হতে সংযমী হওয়া

হযরত বিশ্‌রে হাফী (রাহঃ) আরো বলেন, দুনিয়ার আদরণীয় এবং আখিরাতে নিরাপদ থাকা যদি কারো কাম্য হয়, তাহ্‌লে সে যেন মুহাদ্দিছ, স্বাক্ষী এবং ইমাম না হয়। কারো খাবারও যেন সে না খায়। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রাহঃ) বলেন– আলোচ্য বাণীর প্রয়োগপাত্র হচ্ছে তা, যা আমি শিরোণামে চিহ্নিত করেছি।

ফায়াদা ঃ হাদীস বর্ণনাকারী যদি অন্য কেউ থাকেন, বিশেষ প্রয়োজনীয়তা যদি দেখা না দেয়, তাহ্‌লে মোহাদ্দিসের আসন গ্রহণ করা উচিত নয়। আর যদি হককে যিন্দাহ্‌ করার জন্য স্বাক্ষীদাতা কেউ থেকে থাকে, তাহ্‌লে স্বাক্ষী প্রদান থেকে মুক্ত থাকা উচিৎ। অনুরূপ ইমামতির যোগ্য আর কোন ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান থাকলে ইমাম হতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। শরীয়ত স্বীকৃত কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা যেমন স্বীয় দরকার অথবা দাওয়াতকারীর মন জয়ের প্রশ্নে দেখা না দেয়, তখন কারো খাবার গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

হযরত মুফ্‌তী সাহেব (রাহঃ) বলেন, গ্রন্থকার হযরত থানবীর (রাহঃ) উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা সে সংশয়টুকু পরিলুপ্ত হয়ে গেছে যে, হাদীস বর্ণনাকারী, ইমাম এবং সাক্ষী হওয়া অনুরূপ অন্যের খাবার গ্রহণ করার স্বপক্ষে নবী (সাঃ) খুলাফায়ে রাশিদীন এবং ইমামগণের অবস্থা বর্ণিত রয়েছে। তা সত্বেও নিষেধ করার যুক্তি কোথায়? অথচ প্রয়োজন মুহূর্তে তাঁরা এসব গ্রহণ করেছেন।

সাহচার্যের প্রতিক্রিয়া

হযরত বিশ্‌রে হাফী (রাহঃ) বলতেন, অসৎ লোকদের সুহ্‌বত সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকদের প্রতি কুধারণা সৃষ্টির কারণ হয়। অপর দিকে সৎ লোকের সুহ্‌বত অসৎ লোকের প্রতিও সুধারণা সৃষ্টির কারণ হয়। এমন বান্দাহ্‌ কেউ নাই, অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক কাউকে কখনো জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি আমার বান্দাহ্‌দের সম্পর্কে সুধারণা কেন রেখেছিলে? আলোচ্য

বার্ণর মূলকথা হচ্ছে, সৎ লোকের সংস্পর্শে অসৎ লোকের প্রতি যে সুধারণা সৃষ্টি হয়, তা অবাস্তব হলেও এতে কোন প্রকার বাঁধা নিষেধ নেই। তাই ক্ষতি হওয়ার আশংকাও নেই।

আত্মগোপনের ফজীলত

হযরত বিশ্রে হাফী (রাহঃ) বলতেন, লোকসমাজে অপরিচিত থাকা এবং তাদের উচ্চতর মর্যাদা লোক চোখে গোপন থাকা এ যুগে ফকীর সূফীদের পরম সৌভাগ্য। কেননা মানুষের সাথে দেখাশুনা ও সাক্ষাত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধ্বংসের কারণ হয়।

ফয়দা ঃ উপরোক্ত বাণীর কারণ হচ্ছে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই আজকাল দ্বীন দুর্বল। এ জাতীয় লোকজন বেশী সময় গীবত এবং গুনায় লিপ্ত থাকে। কমপক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয় এবং অনর্থক কথায় তো এরা সময় নষ্ট করেই।

হযরত হারিছ ইবনে উসায়দ মুহাসিবী (মৃত -২৪৩ হিঃ)-এর বাণীঃ

স্বভাব জনিত কামনা –বাসনা তাওয়াকুলের খেলাফ নয়

তাঁর খিদমতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আল্লাহর উপর যাঁরা তাওয়াকুল করেন, স্বভাবগত ভাবে তাদের মধ্যে লোভ–লালসা আসতে পারে কি? জওয়াবে তিনি বললেন, এটি হচ্ছে সাধ্যের উর্ধ্বের বিষয় যা তাওয়াকুলের জন্য ক্ষতিকর নয়।

হযরত শাকীক ইবনে ইবরাহীম বালাখী (১) (রাহঃ) এর বাণীঃ

শরীয়ত সম্মত কোন ওযর ব্যতীত হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়ার নিন্দা

হযরত শাকীক (রাহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রাহঃ)–এর খিদমতে হাযির হই। তিনি বলেন, আমি একবার হযরত খিযির (আঃ)–এর সাথে একত্রিত হলে তিনি আমার সামনে সবুজ রংয়ের

টীকা ঃ ১। তিনি হযরত ইব্রাহীম ইব্‌নে আদহাম (রাহঃ)–এর শিষ্যদের একজন ছিলেন।

একটি পেয়ালায় করে সাক্‌বাজ (এক প্রকার তরল সুরুয়া এর সাথে তিক্ততা মিলিত করা হয়।) এর সুগন্ধি উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, ইবরাহীম! খাও। আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে তিনি বললেন আমি ফেরেশ্‌তাদেরকে একথা বলতে শুনেছি, কাউকে যদি হালাল কিছু দেয়া হয়, আর শরীয়ত সম্মত কোন ওযর ছাড়া সে তা কবুল না করে, তাহলে সে ব্যক্তিকে এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন করা হয়, যা সে চাইলেও তাকে দেয়া হয় না।

হযরত ইয়াহ্‌হয়া ইবনে মুয়ায (মতৃ -২৫৮ হিঃ) এর বাণীঃ

অনিষ্টকারী সাহচার্য সম্পর্কে

তিনি তাঁর আপনজনদেরকে বলতেন, তিন ধরনের মানুষের সংস্পর্শ হতে বেঁচে থাকবে। অলস আলিম সমাজ, আপোষকামী, সুবিধাবাদী দ্বীন প্রচারক এবং দ্বীনি ইলম হাসিল করার পূর্বেই মুসাহাদাহ্‌ত নিষ্ক্রীয় দরবেশ যারা প্রয়োজনীয় ইলমে দ্বীন হাসিল করার ব্যাপারে অলসতা দেখিয়েছে।

অন্তরঙ্গ বন্ধু কম হওয়ার কারণ

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (রাহঃ) বলতেন, আল্লাহ্‌র ওলী যারা হন, তারা বাহ্যিক লৌকিকতার ধার ধারেন না, মুনাফেকীও করেন না। যার অবস্থা হবে এমনটি, তাঁর বন্ধুর সংখ্যা কমই হয়ে যাবে।

আবিদ এবং দুনিয়ার প্রতি বিরাগী যাহেদগণের সন্তান সন্ততির দিকে অবহেলার নিন্দা

হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌নে মুয়ায (রাহঃ) বলতেন, সন্তানদের অভিভাবকগণ তাদের দায়িত্বে ন্যাস্ত সন্তান –সন্ততি ও পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ ও যথাযথ রক্ষণনাবেক্ষণ না করে নফল ইবাদতে লিপ্ত হওয়া মুর্খতা বৈ কিছুই নয়।

হযরত আবু তুরাব নাখশাবী (মৃত –২৪৮হিঃ) এর বাণীঃ
প্রতিটি যুগে আলিমদের অন্তরে যুগোপযোগী হিকমতের উদ্ভব হওয়া সম্পর্কে

তিনি বলেন, প্রত্যেক যুগেই আলিমদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্ পাক এমন ইল্ম ও প্রজ্ঞাময় কথা বের করে দেন, যা সে যুগের অবস্থায় উপযোগী সাব্যস্ত হয়।

আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন ব্যক্তির সাথে আলাপ করার জন্য অবসর হওয়ার অপেক্ষা করা উচিত

হযরত আবু তুরাব (রাহঃ) বলেন, যে লোক আল্লাহ্র যিকিরে নিমগ্ন ব্যক্তির যিকিরে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, আল্লাহর গজব তাকে সাথে সাথে পাকড়াও করে ফেলবে।

বিনা প্রয়োজনে সফর করার অনিষ্টতা

তিনি বলেন, তরীকত ও সুলূকের পথের যাত্রীদের জন্য আমার মতে এর চেয়ে ক্ষতি সাধনকারী আর কিছু নাই যে, শায়খের অনুমতি না নিয়ে নিজের ইচ্ছামত সফরে ঘুরে বেড়ায়।

সীমাহীন তাওয়াযূ

হযরত আবু তুরাব (রাহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় নফ্ছকে ফের আউনের নফছের চেয়েও উত্তম মনে করে, প্রকারান্তরে সে অহংকারকেই প্রকাশ করে।

ফায়দা ঃ এ হুশিয়ারী বর্তমান ঈমানকে কেন্দ্র করে নয়। বরং ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। মানুষের মনে সঠিক অবস্থা এবং রুচি সাধারণ লোকের জানার কথা নয়।

সাইয়্যেদে তাইফা হযরত জুনায়দ (মতৃ ২৯৭ হিঃ) এর বাণীঃ
হাদীয়া উপস্থাপনা কারীর সূক্ষ্ম আদব প্রদর্শন

এক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে পাঁচ দীনার পেশ করত ঃ আবেদন করল, এ হাদিয়া আপনাদের সূফীয়ায়ে- কিরামের মধ্যে বন্টন করে দিবেন। হযরত জুনায়দ (রাহঃ) বললেন, তোমার কি এ ছাড়া আর কোন সম্পদ আছে? সে ব্যক্তি বলল ঃ জী হ্যাঁ! আছে। হযরত বললেন তুমি কি চাও যে, তোমার সে সম্পদ আরো বেড়ে যাক? সে ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ আমি তা চাই! হযরত জুনায়দ (রাহঃ) উত্তর শুনে বললেন, এ দীনার তুমি–ই রেখে দাও। যেহেতু তুমি আমাদের অপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত উক্তির মর্ম হযরত জুনায়দের (রাহঃ) ভাষায় আমরা এ দীনারের প্রতি মোটেই আসক্ত নই। আর বৃদ্ধি পেতে থাকুক তাও চাই না। অথচ তোমার কামনা তাই। ঐ ব্যক্তি তাঁর কাছে অতিরিক্ত সম্পদ থাকার কথা সম্ভবতঃ এ জন্য স্বীকার করেছিল যে, তাহলে হযরত হাদীয়া প্রত্যাখ্যান করবেন না এই মনে করে যে, এ ব্যক্তি তাঁর কাছে যা আছে সমস্তই নিয়ে এসেছে। তাই গ্রহণ করে নিলে পরে সে কষ্ট পাবে। অথচ এ বিষয়টাই প্রত্যাখ্যানের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আর এও হতে পারে হয়তো ঐ ব্যক্তির মনে মনে গুপ্ত আশাও ছিল, যদি এ বুযুর্গকে হাদিয়া প্রদান করতে পারি আমার সম্পদে উন্নতি আসবে। অথচ এ মনোভাব ইখলাছের পরিপন্থী। যদ্দরুন শায়খ জুনায়দ (রাহঃ) জিজ্ঞাসা করে তা প্রত্যাখ্যানই করে দিলেন। উপরোক্ত বিশ্লেষণ মুফতী শফী ছাহেব (রঃ) –এর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে। হযরত থানবীর (রঃ) এর বর্ণনা হচ্ছে– সুফিয়ায়ে –কিরামের চিন্তাধারার আলোকে হযরত জুনায়দ (রাহঃ) –এর আচরণটির এ ব্যাখ্যাও হতে পারে, হযরত জুনায়দ (রাহঃ) হাদিয়া প্রদানকারীর মধ্যে লোভ –লালসার ধরণ অবলোকন করে ছিলেন। ফলে এ আশংকা হয়েছিল– হাদিয়া প্রদান করে পরে সে আক্ষেপ করবে। অতএব, তিনি এমন সূক্ষ্ম একটি পথ বের করলেন যদ্বারা উত্তর হয়ে যায় এবং তার মনেও যেন কষ্ট না আসে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানী ।

হযরত রুবায়ম ইবনে আহমদ (মৃত ৩০৩ হিজরী) এর বাণীঃ
উদারতা ও কঠোরতার প্রয়োগক্ষেত্র

তিনি বলেছন, প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞার দাবী হচ্ছে, শরীয়তের বিধি–বিধানের ক্ষেত্রে ভাই মুসলমানকে সরল পথে পরিচালিত করা। (অর্থাৎ যতটুকু শরীয়তের পক্ষ হতে তার জন্য সুযোগ ও অবকাশ আছে তার

সদ্ব্যবহার করা) কিন্তু নিজের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা চাই। অর্থাৎ তাকোয়া এবং পরহেযগারীর দিকে খুব দৃষ্টি রাখা চাই কেননা, সাধারণ মুসলমাদের ব্যাপারে সহজ ও সরল দিকটি নিরুপণ করা। মুলতঃ আমলেরই অনুকরণ করা। আর স্বীয় নাফছের ব্যপারে কঠোরতা অবলম্বন করা তাকোয়ার দাবী।

অত্যধিক মেলামেশা ক্ষতিকর, যদিও তা নেককারদের সাথেই হোক না কেন

হযরত রুবায়ম (রহঃ) বলেন, সুফীয়ায়ে-কিরাম তাবাত কল্যাণে থাকবেন, যাবত তাঁরা পরস্পর এক হতে অপরে একাগ্রচিত্ততা অবলম্ব করবেন। যখন তাঁর পরস্পর মেলামেশা শুরু করবেন তখন তারা ধ্বংস হতে থাকবেন।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ এমন মেলামেশা যা অর্থহীন কেবল সময়ের অপচয় হয়।

হযরত শাহ ইবনে সুজা কিরমানী (১) (রহঃ)-এর বাণীঃ

স্বীয় গুণকে গুণ মনে করা উহাকে বরদাদ করার নামান্তর

তিনি বলতেন, গুণ ও সম্মান তখনই টিকে থাকেব, যতক্ষণ নিজের দিকে তার নিজের দৃষ্টি না পড়বে। কিন্তু দৃষ্টি পড়ে গেলে সে গুণ সম্মান টিকে না। অনুরূপ - আল্লাহয় ওলীদের বিলায়াত থাকবে ততক্ষণ, তাদের বিলায়াতের দিকে গর্বের দৃষ্টি যতক্ষণ না পড়বে। দৃষ্টি যখন পড়ে যাবে, তখন তা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

ফায়দা ঃ আত্ম-গৌরবের কারণে মর্যাদা. গুণ এবং বিলায়ত টিকে থাকে না যে সব ওলীগণ স্বীয় বিলায়াতের কথা ঘোষণা করেছেন, তা

---

(১) টিকা ঃ হযরত কিরমানী (রহঃ) শাহ আবু তুরাব (রহঃ) - এর শাগরিদ ছিলেন ।

আত্ম-গৌরবের ভিত্তিতে ছিল না। তা ছিল গুপ্ত নির্দেশ কিংবা দ্বীনী হিত কামনার নিমিত্ত।

আল্লাহর ওলীগণকে ভালবাসা এবং তাঁদের স্নেহভাজন হওয়ার ফযীলত

হযরত শাহ ইবনে সুজা কিরমানী (রহঃ) বলেন, আবিদের ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হচ্ছে সেটি যার ফলে তিনি আল্লাহ্র ওলীদের মহব্বতের পাত্র হওয়ার প্রয়াস পান। কেননা যখন তিনি আল্লাহ্র মাহ্বুবদেরকে মহব্বত করবেন, তখন যেন আল্লাহকেই মহব্বত করা হল। আর আল্লাহার মাহবুবগণ যখন তাকে মহব্বত করবে তখন যেন তাকে আল্লাহই মব্বত করলেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে উমার হাকিম ওয়াররাক (৯১) (রহঃ) - এর বাণী ঃ

তরীকতের প্রাথমিক স্তরে লোকদের জন্য সফর করা অহিতকর

তিনি তাঁর মুরীদগণকে ছফর, ভ্রমণ এবং পর্যটন থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন। তিনি বলতেনঃ সার্বিক কল্যাণে চাবিকাঠি হচ্ছে স্বীয় আমলের স্থলে দৃঢ়তার সাথে জমে বসে থাকা। যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় হালে পরিপক্কতা না আসবে আর্থাৎ ধারণাজগত এবং আমলগুলো একটি অবস্থায় স্থিতিশীল না হবে। একটু -অস্বস্তি আসলে তা দুরীভূতঁ হয়ে যায়।

যখন মুরীদের কর্মধারা স্থিতিশীল হয়ে যায়, তখন বরকতের প্রাথমিক ফলাফলের বিকাশ শুরু হয়। অতএব, প্রথম অবস্থাই যদি ছফরের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া তথা মানসিক স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তখন সূচনাতেই সে অবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং তার থেকে ভবিষ্যতে বরকতের আশা করা যেতে পারে না।

টীকা ঃ (১) মুহম্মদ ইবনে ওমর (রাহঃ) ছিলেন আহমদ ইবনে খিযির (রাহঃ) যাঁরা দেখেছেন তাঁদেরই একজন।

গুনাহ্গারের বিনয়–নম্রতা ইবাদতকারীর অহঙ্কার অপেক্ষা উত্তম

হযরত মুহাম্মদ ইবনে উমার (রহঃ) বলেন, বদকার এবং গুনাহগারদের বিনয় ও নম্রতা ইবাদতকারীদের তীক্ষ্ণতা ও অহংকার হতে শ্রেষ্ঠতর।

হযরত আহ্মদ ইবনে ঈসা আহ্রায (রহঃ) –এর বাণী ঃ ক্রন্দনের সমাপ্তি কাল

তাঁর খিদমতে আবেদন করা হল যে আরিফ কি কখনো এমন অবস্থা গিয়ে পৌঁছে যেতে পারেন, যখন তার আর ক্রন্দন হয় না ? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ। কাঁদার তীব্রতা থাকে আল্লাহ্র পথের পথিক সালিকগণের যাত্রাকালে। অর্থাৎ তারা যখন স্থান হতে স্থানান্তরে এগুতে থাকে তখন থাকে তাদের অশ্রুধারা। অতঃপর তারা তাদের ওসব স্থান অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌছে আল্লাহ্র হাকীকতের সাথে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। সাথে সাথে আল্লাহ পাকের পুরুস্কাদির স্বাদ আস্বাদন করতে থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবে এদের প্রবাহনমান অশ্রুধারায় ভাটা পড়তে থাকে, এমনকি ধীরে ধীরে তার সমাপ্তিই ঘটে যায়। এরই প্রেক্ষাপটে নবী (সঃ) হাদীসে ইরশাদ করেছেন –

"যদি তোমাদের কাঁদা না আসে তাহলে ভানধরে হলেও কাঁদো"। অর্থাৎ, স্বীয় স্থান থেকে নিম্নে এসে যাও। তাহলে নতুন পথিকগণ তোমাদের অনুসরণ করার সুযোগ পাবে।

ফায়দা ঃ নৈকট্য লাভের পর কাঁদায় অব্যাহত আসা অনিবার্য নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা হয়। কেননা কোন কোন আল্লাহ ওয়ালার মুকাম বা স্তর সমূহ অতিক্রম করার পরও আবেগের চাপের দরুন কাঁদা বা অশ্রু নির্গত হয়ে থাকে। যেমনটি বর্ণনা দিয়েছেন, "হাফ্ত গেরয়া" কিতাবে শাহ আবুল মায়ালী (রহঃ)। উপরোক্ত প্রসঙ্গের আলোকেই তিনি ভাব মধুর কণ্ঠে নিম্নোক্ত ছন্দদ্বয় রচনা করেছেন ঃ

بلبلے برگ گلے خوش رنگ در منقارداشت -

واندر ان برگ ونوا خوش نا لهائے زار راشت

گفتمش در عین وصل ابن فالہء وفریاد چیست

گفت مارا حلوه معشوق دراین کارداشت-

অনুবাদ ঃ

একটি বুলবুল পাখী
চমৎকার রংয়ের ঠোঁট ছিল তার,
এক গোলাপের পাঁপড়িতে
বসা ছিল সে,
এত আনন্দ ও প্রাচুর্য, অথচ ক্রন্দন তার বার বার।
আমার জিজ্ঞাসা–
তোমার মিলন ঘটেছে
তারপরও ক্রন্দন ?
বুলবুলটি বলে দিল,
এতেই রয়েছে প্রেমাস্পদের সব মুল্যায়ন।

আর যাদের কাঁদাকাটি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পর শেষ হয়ে যায় তাদেরও সব সময়ের জন্য বরং তা অধিকাংশ সময়ের ব্যপারে হয়। কখনও তাদের কাঁন্নার অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। নবী (সঃ) এর চেয়ে আল্লাহর নেকট্য লাভ করা হতে পারে ? অনেক ছহীহ হাদীসে তাঁর কাঁদাকাটির কথাও বর্ণিত রয়েছে। হ্যাঁ, আল্লাহর কামেল বান্দাহগণ তখনও অস্থির ও উতলা হয়ে পড়েন না। তাঁদের মধ্যে বিরাজ করে স্থিতিশীলতা ও স্বস্তি।

হযরত মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল মাগরিবী (রহঃ) –এর বাণীঃ

দুনিয়ার মোহচ্যুতি অধিক ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয় ঃ

তাঁর বাণীগুলোর মধ্যে হতে একটি বাণী হচ্ছে, যে দরবেশের দুনিয়ার সম্পৃক্ততা রয়েছে, সে ও যদি ফজিলতের আমল এবং নফল মোটেই আদায় না করে তবুও সে সব আবিদদের অপেক্ষা শ্রেয়, যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে দুনিয়ার সাথে দুনিয়া বর্জনকারী একজন দরবেশের অনুপরিমাণ আমাল –ইবাদত দুনিয়াদারের পাহাড় তুল্য আমলের তুলনায় উত্তম।

হযরত আহ্মদ ইব্নে মাস্রুফ (মৃত -২৯৯ হিঃ) -এর বাণীঃ

আকল বা বুদ্ধির অনুসরণের সীমা রেখা

যে ব্যক্তি তার আকলের হিফাজতের উদ্দেশ্যে আকলের মাধ্যমে তার আকলে বিপদ হতে সংযত না হয়, সে ধ্বংস হবে তার আকলেরই কারণে।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ, কেউ কেউ আকল বা বুদ্ধির অনুসরণ এত অতিরিক্ত করে যে, মনে করে আকলে সিদ্ধান্তই নির্ভূল। এর সাহয্যে বের হয়ে যেতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। আসমানী ওহী ও নবুওতের গন্ডি হতে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যেমনি ঘটেছে যে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমার বরণীয় ওস্তাদও পথিকৃত হযরত মওলানা সাইয়্যেদ আসগর হুসায়ন সাহেব (মুহাদ্দিস দারুল উলুম দেওবন্দ) এ প্রসঙ্গেই জনৈক বুযুর্গের একটি আরবী ভাববহুল উক্তি বর্ণনা করেছেন–

عَقْلُكَ دُوْنَ دِيْنِكَ وَثَوْبُكَ دُوْنَ قَدْرِكَ –

অর্থাৎ, মানুষের জন্য একান্তই কর্তব্য স্বীয় বুদ্ধিকে দ্বীনের চেয়ে নিম্নস্তরের বা অনুসারী রাখা এবং স্বীয় পোশাক তার মর্যাদ হতে নিম্নমানের রাখা।

ইল্মে জাহেরের অত্যাধিক লিপ্ততার অশুভ পরিণতি

হযরত আহ্মদ মাসরূফ (রহঃ) বলেন একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম কিয়ামতের ময়দান। দস্তরখান বিছানো রয়েছে। আমি সেখানে বসতে

চাইলে আমাকে বলা হল, এ দস্তরখানা সুফীয়ায়ে-কিরামদের জন্য। আরয করলাম, আমিও তো তাঁদেরই একজন। তখন আমাকে এক ফেরেশতা বললেন তুমি তাঁদেরই একজন একথা সত্য। কিন্তু হাদীসের প্রতি তোমার অতিরিক্ত ঝোঁক এবং সমসাময়িকদের থেকে বেড়ে যাওয়া ও সম্মান লাভের আশা সুফীদের কাতারে তোমার শামিল হওয়া থেকে অন্তরায় সৃষ্টি করে রেখেছে। আমি আবেদন করলাম, তাহলে আমি তাওবা করছি। আমি সজাগ হয়ে গেলাম অতঃপর সূফীয়ায়ে কিরামের রাস্তায় মনোনিবেশ করলাম মনে মনে বললাম হাদীসে তালীমের জন্য আমি ছাড়া আরো অনেক আলেম রয়েছেন।

ফায়দা ঃ এর দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে ইলমে জাহিরের শিক্ষা ও প্রচার কল্পে অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম আছেন বিধায় বাতিনী সংশোধনের জন্য ইবাদত ও যিকিরে আত্মনিয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনের অধিক জাহিরে ইল্মে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। কেননা স্বয়ং এর দ্বারা উদ্দেশ্য আমল শুদ্ধকরা –যা তরীকতে শেষ কথা।

হযরত ইসমাঈল ইবনে সাহিল (১) (রহঃ)–এর বাণীঃ

কারো প্রতি কোন গুণ বৈশিষ্ট সম্পৃক্ত করা হলো সেদিকে তার দৃষ্টি দেয়া উচিত নয়

তিনি বলেন ফকীহ সেই ব্যক্তি, যার প্রতি ফজিলত বা কৃতিত্ব সম্পৃক্ত করা হলে সে দিকে তার দৃষ্টি দেয়া উচিত নহে। অর্থাৎ এতে তাঁর মনে গর্ব ও অহংকার আসা চাই না।

হযরত অবুল আব্বাস ইবনে আত্তার (২) – এর বাণীঃ

নিজের আমলকে ছোট মনে করা

তাঁর খিদমতে কেউ জিজ্ঞেস করল, হুজুর, পুরুষত্ব বা বীরত্ব কাকে বলা হয়। তিনি উত্তরে বললেন নিজের কোন ইল্ম আল্লাহ তা'আলার জন্য বেশী কিছু মনে না করা বীরত্বের মূল কথা।

---

(১) টীকা ঃ তিনি হযরত জুনায়দ (রহঃ) এর সমসাময়িক ছিলেন।

(২) টীকা ঃ মৃত ৩০৯ অথবা ৩১১ হিঃ।

নিজের নাফছকে সদা সতর্ক করতে থাকা।

হযরত আবুল আব্বাস বলতেন, পূর্ণ মহব্বত হচ্ছে, সব সময় স্বীয় নাফছকে কড়াকড়ি ও জিজ্ঞেসাবাদ করতে থাকা।

হযরত ইবরাহীম খাওয়াসের বাণীঃ

বাহ্যিক ইল্‌মের উপর হাকীকত ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব

তিনি বলতেন ইলম সে ব্যক্তিরই হাসিল হয়েছে যিনি ইলম অনুযায়ী চলেন এবং আমল করেন সুন্নাতকে আঁকড়িয়ে রাখেন। তাঁর বাহ্যিক ইল্‌ম যদি তুলনা মূলকভাবে কমও হয় তাতে কিছু যায় আসে না।

হযরত আবু হামযা বাগদাদী (রহঃ) –এর বাণীঃ

নেক কাজের শুকরিয়া

তিনি বলতেন, আল্লাহ্ পাক যদি তোমার জন্য কোন ভালো কাজের পথ উম্মুক্ত করেন তাহলে তা ধর। তা নিয়ে গর্ব বোধ করার পথ পরিহার কর। তাঁর শোকর আদায় কর যিনি তোমাকে এমন কাজের তাওফীক দান করেছন। কেননা ফখর ও গর্ব তোমাকে স্বীয় মর্যাদার আসন থেকে অধঃপতিত করে দেবে। পক্ষান্তরে এর শুকর বা কৃতজ্ঞতার ফলে নেক কাজে তোমার উন্নতি ঘটতে থাকবে।

প্রয়োজন না হলে কথা না বলাই সঙ্গত

বর্ণিত আছে হযরত আবু হামযা বাগদাদী (রহঃ) খুবই মিষ্টভাষী ছিলেন। একবার অদৃশ্য হতে আওয়ায আসল, তুমি তো কথা বলেছো, বেশ ভালই বলেছো। এখন বাকী রইল তুমি নীরবতা পালন করো। তাও ভালোভাবে করে নাও। অর্থাৎ নীরবতার হক আদায় কার। এজন্য মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কথা বলেন নাই। অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে তিনি বাহুল্য কোন কথাই উচ্চারণ করেন নাই।

হযরত আবু আবদুল্লাহ শিখ্‌খীরি (রহঃ)- এ বাণীঃ

গুনাহর কারণে কাউকে লজ্জা দেয়া ঠিক নয়

হযরত বলেনঃ গুনাহর কারণে কাউকে লজ্জা দেবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এ নিশ্চয়তা তোমার লাভ না হবে যে, তোমার সব গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। একথাও বিদিত যে, এ মর্তব্যা তোমাদের কখনো হাসিল হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত হামিদ তিরমিযী (রহঃ) এর বাণীঃ

আত্মগোপনের বরকত, ওলীর কিছু নিদর্শন

তিনি বলেন আল্লাহর, ওলীগণ সব সময় চেষ্টা করে নিজেকে অপরিচিত রাখার জন্য গোপন থাকার জন্য। কিন্তু জগতে তাঁর বিলায়াতে মেতে ওঠে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তালার পক্ষ হতেই বিলায়াতের প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

হযরত মুহাম্মদ বিন সায়ীদ ওযাররাক (১) (রহঃ)এর বাণীঃ

ক্ষমার হক

হযরত বলেন, কারো অপরাধ ক্ষামা করে দেয়ার পর মহত্বের লক্ষণ হল তোমরা তার সে অপরাধ পুনরায় উল্লেখ না করা। কেননা তোমার এক ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা করার পর পুনরায় উহার উল্লেখ করা আত্মমর্যাদা ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

কারো প্রতি তুচ্ছভাব এলে এর প্রতিকার

হযরত ওয়াররাক (রহঃ) বলেন আমাদের মনে কারো প্রতি তুচ্ছ ভাব এলে আমরা তার খিদমতে এগিয়ে যাই। দাঁড়িয়ে যাই আমরা তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। যেন আমাদের অন্তর থেকে সে ধারনা দূরীভূতঃ হয়ে যায়।

---

(১) টীকা ঃ ৩২০ হিঃ সনের আগে ওফাত হয়েছে।

হযরত মামশাদ দীনূরী (রহঃ) এর বাণীঃ

আল্লাহর ওলীগণের সাহচার্যে থাকার আদাব

তিনি বলেন, যখন আমি কোন বুযুর্গের খিদমতে হাযির হওয়ার ইরাদা নিয়েছি তখন আমার অন্তর সর্বপ্রকার নিসবাত (সম্বন্ধ), ইলম এবং মা'রিফাত হতে শূণ্য করে নিয়েছি। অপেক্ষায় রয়েছি তাঁদের সুষামা মন্ডিত সাক্ষাত এবং বাণী দ্বারা আমার দিকে কি কল্যাণ আসতে যাচ্ছে ? কেননা বুযুর্গের সাক্ষাতে গেলে নিজেক শূন্য না ভেবে পূর্ণ ভাবলে তাঁর সাক্ষাত, সংস্পর্শ আদাব এবং বাণীর বরকত হতে বঞ্চিত থাকতে হয়।

হযরত খায়র নাস্‌সাস (২) (রঃ) এর বাণী ঃ

নিজের দোষ ত্রুটি স্মরণে আসার বরকত

তিনি বলেছেন বান্দাহ্ উচ্চ শিখরে পৌঁছে কামিল হওয়া সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে স্বীয় ত্রুটি দুর্বলতা ও হীনতাকে মনে উত্থাপন করা।

হযরত হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ সাবখী (রহঃ) –এর বাণীঃ

কোন বস্তু হতে সম্পর্ক ছিন্ন করার নিয়ম

তিনি বলতেন, কোন বস্তু বা বিষয় তোমাদের সম্পর্ক পর্যন্ত ছিন্ন করতে পারে না যতক্ষণ তোমাদের নিকট রক্ষিত বিষয় হতে তা উত্তম নয়। সম মনা কিংবা নিম্নমানের বিষয় উচ্চমানের বিষয় হতে তোমাদের মনকে আকর্ষণ করতে পারে না। কেননা অন্তরে যে বিষয়ের চিন্তা প্রবল, বাস্তবে তার প্রভাবই প্রাধান্য পায়।

হযরত আবু আলী মুহম্মদ ইব্‌নে আবদুল ওয়াহাব ছাকফী (রহঃ) – এর বাণীঃ

(তিনি হযরত হামদুন কাফ (রহঃ) –এ সাক্ষাত লাভ করেন)

---

(২) *টীকা ঃ* মৃত্য ১৯৭ হিজরী।

পথপ্রদর্শক বা মুরব্বী হওয়ার পূর্ব শর্ত

তিনি বলতেন, কেউ ইল্‌ম সম্পূর্ণ রূপে হাসিল করেছে, সব সিলসিলার বুযুর্গের সান্নিধ্য লাভ করেছে অথচ সে আদব ও প্রশিক্ষণদাতা কারো ছায়াতলে থেকে সাধনা ও রিয়াযত করেনি, তাহলে আল্লাহর মারিফাত হাসিলকারীদের মর্যাদায় পৌছা তারপক্ষে সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এমন কোন শায়খের ইসলাহ গ্রহণ না করে, যিনি তাকে মঙ্গলের আদেশ করবেন, অকল্যাণকর বিষয় থেকে নিষেধ করবেন তদুপরি যিনি তার আমলের ত্রুটি ও নফসের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিবেন এহেন ব্যক্তির অনুসরণ আদৌ দুরস্ত হবে না।

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মানাযিল (রহঃ) এর বাণীঃ

(যিনি হযরত হামদুনের সঙ্গী ছিলেন)

অর্থহীন কাজ বর্জন করা

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিস্প্রয়োজনীয় কোন কাজ অত্যাবশ্যকীয় মনে করে আঁকড়ে ধরে, সে তার এমন সব বিষয় বস্তু বিনষ্ট করে দেয়, তাকে যার মুখাপেক্ষী হতে হয় এবং যে গুলি তার একান্ত প্রয়োজনীয়।

সংশোধকারীর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করা সমীচীন নয়

তিনি বলেন, তোমরা যাঁরা ইল্‌মের মুখাপেক্ষী, তাঁরা কারো ত্রুটির দিকে দৃষ্টি দেবে না। কেননা সে দিকে দৃষ্টি দেয়া তোমাদের ইল্‌মের বরকত হতে বঞ্চিত হওয়া বৈ কিছু নয়।

হযরত আবুল খায়ের আকতা (রহঃ) –এর বাণীঃ

(মৃত– ৩৪০ হিজরীর কিছুদিন পর)

তিনি একদা হযরত আবু জাফর (রহঃ)-এর নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করলেন, এ যুগে দরবেশগণ আপনার বিষয়ে মুর্খতা ও অসম্মান প্রদর্শন করেছেন। আপনাদের আচরণই এর কারণ। কারণ, আপনারা পুরো তারবীয়াত ও ইসলাহ গ্রহণ না করেই ঘরে বসে গিয়েছেন।

এদ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নিজে সংশোধন না হয়ে অন্যের সংশোধনের চিন্তা করা ক্ষতিকর।

হযরত আবুল হুসায়ন ইবনে হিব্বান জামাল (রহঃ)

[ইনি খাররায (রহঃ) –এ শাগরিদ]

আল্লাহ্ ওয়ালাদের প্রতি আদবঃ

তিনি বলেন, আল্লাহ্ ওয়ালাদের মর্যাদার মূল্যায়ন করা তাদের দ্বারাই সম্ভব, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিজেও মর্যাদাশালী।

হযরত মুজাফ্ফর কুরায়সিনী (রহঃ)

[ইনিও আবদুল্লাহ্ খাররায (রহঃ) – এর শাগরিদ]

আগে নিজে কোন শায়খে কামিলের ইসলাহ্ গ্রহণ, ওপরে অন্যের ইসলাহের চিন্তা

তিনি বলতেন, কোন প্রজ্ঞাবান হাকীমেব সাহাচর্যে নিজে সংশোধন গ্রহণ না করলে তার দ্বারা কোন মুরীদ কখনো সংশোধন হওয়া সম্ভব নয়।

হযরত আবুল হুসায়ন আলী ইবনে হিন্দ (রহঃ) এর বাণীঃ

বুযুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুফল

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বুযুর্গদের দ্বীনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির অন্তরে তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে ইহা হতে বঞ্চিত ব্যক্তির মান–মর্যাদা মাখলুকের অন্তর থেকে বিলোপ করে দেন। এমনকি তাকে লাঞ্ছিত দেখতে পাবে। যদিও তার স্বভাব চরিত্র বাহ্যিক ভাবে দুরস্তই হোক না কেন।

হযরত আবুল আব্বাস (রহঃ)-এর বাণী ঃ

মুশাহাদায় স্বাদ থাকে না কেন?

তিনি বলেন, বুদ্ধিমান কেউই মুশাহদা দ্বারা স্বাদ বা তৃপ্তি পায় না। কেননা, আল্লাহর কুদরতের মুশাহাদা বা রূহানী দর্শন কেবল নিজেকে

অস্তিত্বহীন ও বিলীন করার পরই হাসিল হয়ে থাকে। যার মধ্যে স্বাদ ও আনন্দ বলতে কিছুই নাই।

হযরত আবু বকর তিমিস্তানী (রহঃ) মৃত– ৩৪০ হিঃ)-এর বাণীঃ

নাফসের ধোঁকা থেকে নিশ্চিন্তা থাকা

তিনি বলেন, নাফ্স হচ্ছে আগুন সাদৃশ। একখান থেকে নিভে অন্য খান দিয়ে জ্বলে ওঠে। নফসের অবস্থাও অনুরূপ যে, চেষ্টা -সাধানা ও রিয়াযত -মুজাহাদা দ্বারা তাকে একদিকে শায়েস্তা করা হলে অপরদিকে সে প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবিত হয় পড়ে।

হযরত আবুল কাসেম ইবনে ইবরাহীম (মৃত–৩৬৭ হিঃ)-এর বাণীঃ

সুলূকের চেয়ে খোদাপ্রদত্ব উদ্দীপনার গতি তীব্র

তিনি বলেন, মুরীদীর চেয়েও উদ্দীপনা বা জযবার ক্রিয়া কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ব জযবা মানুষকে মানব জিনের আমল থেকে মুখাপেক্ষী করে দেয়।

তরীকতের সার কথা

তিনি বলতেন,তাসাওউফের মূল কথা হচ্ছে, কোআন –হাদীসকে আঁকড়িয়ে ধরা, খাহেশ ও বিদয়াতি থেকে সংযত থাকা, বুযুর্গগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং মানুষের ওযর–আপত্তি কবুল করা। অর্থাৎ, যতটুকু সম্ভব শরীয়তের গন্ডির ভেতর থেকে মুবাহ্ ও জায়েয বিষয়ে কারো সাথে কঠোর আচরণ না করা। তদুপরি আমল অযীফা নিয়মিত আদায় করা। আর রুখসত তথা জায়েয বিষয়ে কুটনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সযত্নে পরিহার করে চলা।

ফায়দা ঃ হযরত থানবী (রাঃ) বলেন উপরোক্ত বাণীতে দুইটি শব্দ রয়েছে একটি রুখ্ছত, দ্বিতীয়য়টি বাতীল্ এখানে রুখছতের দ্বারা উদ্দেশ্য কি তা বুঝানো হয়েছে। তাবীল দ্বারা না হলে রুখসত অর্থাৎ শরীয়তে যার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা, যে

বিষয়টি করতে শরীয়ত স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি ব্যক্ত করেছে সেটা মূলতঃ শরীয়ত বিষয়েরই আওতাভুক্ত।

হযরত আহমদ ইবনে আতা রোদবারী (মৃত -৩৬৯ হিঃ)–এর বাণীঃ

বিনা দরকারে কৃপণতার নিন্দা

তিনি বলতেন, যে সূফী কৃপণ সে সর্ব নিকৃষ্ট জীব। ইমাম শায়রানী (রহঃ) বলেন, এখানে কৃপণতার অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন ছাড়াই সম্পদকে পুঞ্জীভূতঃ করা। কেননা, প্রযোজন বশতঃ সম্পদকে পুঞ্জীভূতঃ করা তো সুন্নাত।

শালীনতা বিহীন খিদমত করার পরিণাম

হযরত আহমদ ইবনে আতা (রহঃ) বলেন, অশালীনতার সাথে যে ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালাদের খিদমত করবে সে অবশ্যই ধ্বংস হবে।

হযরত আলী বুন্দার (রহঃ) –এর বাণীঃ

[জুনায়দ বুগদাদী (রহঃ) –এর শাগরিদ]

নিজেকে তুচ্ছ মনে করা

তিনি বলেন, যে যুগে আমাদের ন্যায় লোকদেরকে 'সুলাহা' বা নিষ্ঠাবান আখ্যা দেয়া হয়, সে যুগে নিষ্ঠা বা মঙ্গলের কোন আশা করা যেতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ ইবেন আবদুল খালিক দ্বীণূরী (রহঃ)-এ বাণীঃ

যুহ্দ এবং মা'রিফাত -এর বিকাশস্থল ঃ

হযরত বলতেন, যুহ্দ বা দুনিয়ার প্রতি বিরাগী হওয়ার ত্যাগ তিতিক্ষার প্রভাব পড়ে দেহে। আর মা'রিফাত সাধনার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অন্তরে। যুহ্দের সাধানা সম্পর্কে সাধারণ জনও অবহিত হতে পারে। মা'রিফাত সাধনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাদের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব হয় না। যেহেতু এটি অতি সূক্ষ্মতম সাধনা। যেমন কবি বলেছেন। ঃ

ائے تراخارے شکستہ کی دانی کہ چیست

حال شیرالے کہ شمشیر ہلاہر سرخورند

"ওহে ! তোমার পায়ে যখন কাঁটা বিঁধেনি তখন তুমি এ যাতনা যে কত তীব্র তা অনুভবই করতে সক্ষম হবে না। যে সব বীর পুরুষদের শিরের উপর সব সময় তরবারি ঝুলে তাদের অবস্থা তুমি কি অনুধাবণ করবে। ?

অধিক কথা বলা অপকারিতা

হযরত মুহাম্মদ খালিক দ্বীনূরী (রহঃ) বলতেন, অধিক কথা বলা নেক আমলকে এমন ভাবে শুষে নেয়, জমীন যেরূপ পানি শোষণ করে নেয়।

হযরত সায়্যেদী আবদুল কাদির জীলি (রহঃ) (মৃত– ৫৬১ হিঃ) –এর বাণীঃ

বিপদে আক্রান্ত হওয়ার বিভিন্ন ধরণ ও নিদর্শন

মানুষের উপর যে সকল বিপদ –আপদ আসে, তার কারণ গুলো বিভিন্ন প্রকার। এতে কখনো থাকে আল্লাহর ক্রোধ, এর দ্বারা কখনো সে ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ করা হয়। আবার কখনো বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

হযরত শায়খ আবুদল কাদের জীলি (রহঃ) এগুলোর নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিপদ যদি শাস্তি প্রদানে নিমিত্তই হয়, তখন তার নিদর্শন হল– আক্রান্ত ব্যক্তি ধৈর্যহারা হয়ে হায় হুতাশে অস্থীর ও উত্তাল হয়ে ওঠে। মানুষের কাছে শিকায়েত করা শুরু করে। আর গুনাহ্ মাফের জন্য যে পরীক্ষার বিপদ আসে তাতে তাকে প্রদান করা হয় 'ছবরে জামীল 'তথা অনুপম ধৈর্যের সৌভাগ্য। এতে থাকেনা। শিকায়েতের কিঞ্চতের ভাব, থাকেনা অস্থির ভাব এবং সংকীর্ণতার লেশ। ইবাদত বন্দেগী করতে কোন প্রকার বিঘ্নতাই সৃষ্টি হয় না। আর যে বিপদ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় উহার নিদর্শন হল–'খোদার খুশীতে থাকার' ভাব মনে দ্বীপ্ত থাকে। মনে এক প্রকার প্রশান্তির ভাব অনুভূতঃ হতে থাকে। এমনি এক শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে তার বিপদ কেটে যায়।

হযরত মুহাম্মদ শনবিকী (রহঃ) – এর বাণী ঃ

[হযরত জীলি (রহঃ) -এরও আগের মণীষী]

ওলী হওয়ার আনুষাঙ্গিকতা

তিনি এ বাণীটি একাধিক বার বলেছেন, প্রকৃত ওলী তিনি। যিনি স্বীয় অবস্থা লুক্কায়িত রাখার চেষ্টা করেন। অথচ জগদ্বাসী তাঁকে ওলী বলে চিনে ফেলে। স্বীকৃতিও দেয়। অর্থাৎ, ওলী নিজের কিছু প্রকাশ না করলেও লোকজন অনায়াসে তাঁর পরিচয় পেয়ে যায়।

হরত শায়খ আকীল মান্বাজী (রহঃ) –এর বাণীঃ

(তিনি ছিলেন হযরত আদী ইবনে মুসাফিরের শায়খগণের একজন, একটু পরে তাঁর আলোচনা আসছে।)

আল্লাহর নিকট সমর্পণের মধ্যেই নেক কর্মের সাফল্য নিহিত

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্য ধন–দৌলত বা অন্য কোন বিশেষ মর্যাদা অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি মা'রিফাতের রাস্তা থেকে অনেক দূরে।

হযরত আদী ইবনে মুসাফির (মৃত–৫৫৮ হিঃ) –এর বাণীঃ

(তাঁর প্রশংসা স্বয়ং সাইয়্যেদ আবদুল কাদির জীলি (রহঃ) করেছিলেন।)

শায়খে কামিলের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্বশর্ত

তিনি বলতেন , নিজের শায়খে কামিলের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি বা কল্যাণ সাধন করা যায় না।

অপরকে ইস্‌লাহ্ করার জন্য সর্ব প্রথম নিজে কোন শায়খের নিকট তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অপরিহার্য

তিনি একাধিকবার একথা বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন শায়খে কামিলের সান্নিধ্যে থেকে তা'লীম তারবিয়্যাত ও আদব -কায়দা শিখেনি, সে ব্যক্তি আপন অধীনস্থ–অনুগামীদিগকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

হাকীকত বা মূলতত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে তত্ত্ব সন্ধান ক্ষতিকর

তিনি বলতেন যে, যে ব্যক্তি বাতেনী ইলমের নিগুঢ়তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অবগতি হাসিল ছাড়াই শুধুমাত্র মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদকেই যথেষ্ট মনে করে, সে ব্যক্তি তরীকতের পথ থেকে বিচ্যুত ও সুদূরে নিক্ষিপ্ত।

শায়খ আবু নাজীব সুহ্‌রাওয়ার্দী (মৃত-৫৬৩ হিঃ)–এর বাণীঃ

আধ্যাত্মিকতার মঞ্জিল সমূহ

তিনি প্রায়ই বর্ণনা করতেন, আধ্যাত্মিকতার প্রথম ধাপ হল "ইল্‌ম" ও দ্বিতীয় ধাপ হল "আমল্" এর সর্বশেষ ধাপ হল আল্লাহ্ অনুগ্রহ।

কেননা, ইলম গন্তব্যস্থল সনাক্ত করে দেয়, আর আমল সেই গন্তব্য–স্থলের যাত্রাকে সুগম করে দেয় এবং সবশেষে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

হযরত শায়খ আহমদ ইবনুল হুসাইন –আল– রেফায়ী– (রাহঃ) (মৃত-৫৭০ হিঃ)–এর বাণীঃ

দান-সদকা নফল –ইবাদত থেকে উত্তম

তিনি বলতেন যে, দৈহিক নফল ইবাদত থেকে দান -সদকা করা উত্তম।

হযরত থানবী বলেন, এর কারণ হল, সদকার উপারিতা গণমুখী এবং ইহা নফসের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক কাজ।

বিনা প্রয়োজনে ভ্রমণ করা ক্ষতিকর ঃ

প্রয়োজনে ভ্রমণ করা ক্ষতিকর

তিনি বলতেন যে, ভ্রমণ সূফী–সাধকগণের দ্বীনকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয় এবং তার একাগ্রতাও আত্মিক প্রশান্তিতে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, তার কারণ হল ভ্রমণের ফলে দৈনন্দিনের আমল সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হয় না, বরং তার মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং সময়ের অপচয় ঘটে।

মুরীদের জন্য কয়েকটি আদব

তিনি বলতেন,স্বীয় লক্ষ্য পথে মুরীদের অগ্রসর হওয়ার নিদর্শন হল স্বীয় শায়েখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ কালে তাকে কষ্টে ফেলবে না। বরং তাঁর যাবতীয় নির্দেশ যথাযথ পালন করবে এবং তাঁর ইঙ্গিতের প্রতি আনুগত্য করবে। অধিকন্ত এমন শায়েখ তাকে নিয়ে অপরাপর দরবেশগণের উপর গৌরব যেন করতে পারে যে, আমার এই মুরীদ কত ভাল। এমন যেন না হয় যে, সে নিজে শায়েখের আশ্রয় নিয়ে গৌরব প্রকাশ করবে।

মানুষের দোষ -ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না করা

তিনি বলতেন যে, সুফী –সাধকগণের জন্য এটাও একটি শর্ত যে, অপরাপরাপর মানুষের দোষ –ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না করা।

হযরত আলী ইবনুল হায়নি (রহঃ) (মৃত ৫৬৪ হিঃ) এর বাণীঃ

কামিল ওলীগণের জন্য নির্জ্জনতা শর্ত নয়

হযরত আলী ইবনুল হায়নী (রহঃ) সুদীর্ঘ আশি বছর পর্যন্ত এভাবে জীবন যাপন কারে ছিলেন যে, তাঁর জন্য কোন পৃথক কুটীর ছিল না, ছিল না, কোন নীরব প্রান্ত, বরং তিনি সাধারণ দরবেশগণের সমাবেশেই ঘুম নিদ্রা ও বিশ্রাম করতেন। তার একমাত্র কারণ ইহাই ছিল যে, তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে বাতেনী দৌলত লাভ করে ছিলেন।

খোদাপ্রেমে গভীর মগ্ন অবস্থায় শরীয়তের সীমা লংঘন না করাতেই কামাল বা পূর্ণতা নিহিত

তিনি বলতেন যে, সাহেবে হাল যদি তার উন্মাত্তাবস্থায় শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম করা থেকে নিরাপদে থাকে, তবে এটাই হবে তার পূর্ণতা হাসিলের লক্ষণ, সচেতন অবস্থায় যেরূপ সে ধ্যানে মগ্ন থাকে।

অর্থাৎ, যখন উন্মত্ত অবস্থায় থাকে তখন সে আত্মহারা হয় না, সুতরাং ইহা তার চরম ও পরম কামিয়াবীর লক্ষণ।

বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন হালই স্থায়ী নহে

তিনি বলেছেন, বাতেনী হালতের দৃষ্টান্ত বিদ্যুত চমকের ন্যায় যে, আকাশে চমকানোর পূর্বে উহা হাসিল করা যায় না, কিন্তু হাসিল হওয়ার পর উহা স্থায়ীও থাকে না।

অবশ্য অল্লাহর পক্ষ থেকে সময়ে ব্যক্তি বিশেষের জন্য খোরাক বানিয়ে দেয়া হলে আল্লাহ্ নিজেই তার অবস্থার সংশোধন করে থাকেন। এমনকি উক্ত হাল বা অবস্থা তার কাম্য ও ভূষণে পরিণত হয়। অর্থাৎ, এ 'অবস্থা 'তার জন্য স্থায়িত্বের রূপ ধারণ করে।

হযরত অবদুর রহমান তাফসুঞ্জী (রহঃ) এর বাণীঃ

বিনয়–নম্রতা মানুষের আমলগত ত্রুটি–বিচ্যুতর ক্ষতি পূরণ আর অহংকার দ্বারা আমলের ক্ষতি সাধন।

তিনি বলে থাকতেন যে, বিনয়ের সাথে বে–আমলী ক্ষতিকর নয়। যখন ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নতে মোয়াক্কাদার পাবন্দ হয়। অধিকন্ত প্রার্থিত ইলমে দ্বীনও হাসিল হয় না।

শায়খ আবু আমর ওসমান ইবনে মারজুক কারশী (রহঃ) (মৃত- ৫৬৪ হিঃ) – এর বাণী ঃ

স্থিরতা অর্জন করার পূর্বে দরবেশী চাল–চলন অবলম্বন করা ক্ষতিকর

তিনি তার মুরীগণকে লক্ষ্য করে বললেন –খোদ প্রেমে যাঁরা দেওয়ানা তাঁদের চাল–চলন ও বেশ ভুষা গ্রহণ করা থেকে তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তরীকতের মাঝে পাকাপোক্ত ও স্থিরতা অর্জন না করে থাক। কেননা, এ জাতীয় চাল চলন তেমাদেরকে তাসাওউফের মঞ্জিল অতিক্রম করা থেকে বিরত রাখবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেনঃ তার কারণ হল, এর ফলে রিয়া ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকার নিরাপত্তার আশা করা যায় না।

শায়েখ আবু মাদইয়ান (রহঃ)-এর বাণী ঃ

(যিনি ৪৫০ হিঃ সনে জীবিত ছিলেন।)

লাভ জনক ও সর্বোত্তম মুশাহাদা

তিনি বলতেন যে, তোমরা এ কথার মুশাহাদা কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অবলোকন করছেন এবং এ কথার মোরাকাবা কর যে, তোমরা আল্লাহকে দেখতেছ। হযরত থানবী (রহঃ) বলেনঃ এটা এ জন্যই যে, প্রথম অবস্থাটি ফানা তথা আত্মবিলীনের অধিক নিকটবর্তী।

জ্ঞাতব্য ঃ যখন কোন ব্যক্তির ধারণা প্রবল হয়ে যাবে যে,আল্লাহর সদা জাগ্রত চক্ষু আমাকে অবলোকন কারছে তখন সে স্বীয় কু-প্রবৃত্তি ও কামনা- বাসনার অনুকরণ - অনুসরণ বর্জন করবে, এমনকি আপন অস্তিত্বকেও সে বিলুপ্ত মনে করবে, এটাই হল মাকামে ফানা যা তাসাউফের সর্বশেষ মাকাম বা স্তর।

সদাসর্বদা নিজের নফসের প্রতি দৃষ্টি রাখা

তিনি বলতেন যে, যে দরবেশ প্রতি মুহূর্তে এ বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখে যে, আমার হালতের অবনতি হয়েছে না উন্নতি, সে প্রকৃত দরবেশ নয়। (অর্থাৎ সূফী–সাধকের জন্য অপরিহার্য যে, সে সর্বদা আপন হালতের পর্যবেক্ষন করবে; যদি উন্নতি দেখে তবে শুকরিয়া আদায় করবে, আর যদি অবনতি দেখে তবে ক্ষতি পূরণের চিন্তা করবে।)

যে লোক আল্লাহর যিকিরে মশগুল তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করার পরিণতি

তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিকিরেরত ব্যক্তিকে যদি কোন ব্যক্তি যিকির থেকে বিরত রাখে 'তবে আল্লাহ্ তা'আলাও সে ব্যক্তির নিকট থেকে আপন সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল এমন ব্যক্তিকে নিজের কাজে মশগুল করতে চায়, তার প্রতি আল্লাহর গজব নেমে আসে।

হযরত শায়খ আবদুল্লাহ কুরশী মাজযুম (রহঃ)–এর বাণী ঃ

তার কারামত তার স্ত্রীর সাথেই সু-প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থাৎ, তিনি কুষ্ঠরোগী ছিলেন। এতদ্সত্বেও তাঁর স্ত্রী তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার্থে অক্ষুন্ন রেখে ছিলেন।

তিনি যখন স্ত্রীর সান্নিধ্যে গমন করতেন, তখন কারামত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একজন সুশ্রী পুরুষে রুপান্তরিত করে দিতেন। কিন্তু স্ত্রী তাঁর নিকট কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত আকৃতিতে থাকার আবেদন জানান। যাতে করে এখলাস ও নিষ্ঠার মধ্যে কু-প্রবৃত্তি মিশ্রিত না হয়।

সুফী–সাধকগণের সাথে কু-ধারণা পোষণ করার করুণ পরিণতি

তিনি বলেন যে, আমি কখনো এ অবস্থার বিপরীত দেখিনি যে, যে ব্যক্তি প্রকৃত মুখ্লিস সুফী–সাধকগণের সামালোচনা করে বা তাঁদের সাথে বদগুমানী করে। সে সব সময়ই করুণ অবস্থায় থাকে এবং মর্মান্তিক অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এটা তখনই হবে, যখন সে তাঁদের প্রতি নিজর খেয়াল –খুশী মত সমালোচনা করে থাকে। পক্ষান্তরে যদি শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করে থাকে, তবে সে এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

ইখলাসের সর্বোচ্চ স্তর

তিনি এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের দায়িত্ব কর্তব্য হল, ইবাদত বন্দেগী যথার্থ মর্যাদা ও গুরত্বের সাথে পালন করা। এর দ্বারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এমন কামনা না করা। কেননা, যখন আল্লাহ্ তোমাকে তার জন্য মনোনীত করে নিবেন। তখন স্বয়ং তিনিই তোমাকে তাঁর নিকটবর্তী করে নিবেন। পক্ষান্তরে তোমাদের এমন কি ইবাদত আছে যদ্বার তোমরা তার সান্নিধ্য কামনা করবে?

হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবী জামারাহ (রহঃ)-এর বাণীঃ

[ইনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী জামরা ছাড়া অন্য আরেক জন, ৬৭০ হিজরীর কিছু পরে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। তাবাকতে কোবরা গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী এরূপই মনে হয়। কেননা, তার আলোচনা শায়খ আবদুল গাফফার (রহঃ)-এর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরও মৃত্যু উল্লেখিত সনে হয়েছে।]

মুরীদ শায়খের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, এ ধরণের আচরণ থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা

তাবাকাতে কোবরা নামক গ্রন্থে তাঁর কিছু মালফূযাত উল্লেখ করার পর উপসংহারে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখক বলেন যে, এ জন্যই পীর সাহেবগণ বলেছেন যে,শায়খের জন্য শোভনীয় নয় মুরীদের সাথে বসে পানাহার করা এবং বিনা প্রয়োজনে তাঁর সাথে গল্প-গুজব করা। কেননা, এর দ্বারা মুরীদের অন্তর থেকে শায়খের ভক্তি-শ্রদ্ধা কমে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। যার ফলে মুরীদ শায়খের পূর্ণ্যময় সোহ্বতের বরকত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

হযরত শায়খ আবুল হাসান খায়েগ ইস্কান্দরী (রহঃ)-এর বাণীঃ

[তার আলোচনা 'তবকাতে কোবরা' নামক গ্রন্থে শায়খ আবদুল গাফফার কওসী (মৃত ৬৭০ হিঃ) (রহঃ)-এবং শায়খ আবূ মাসউদ ইবনে আবী -আল আশায়ের (মৃত ২৪৬ হিঃ) (রহঃ)-এর পুর্বে উল্লেখিত হয়েছে। যদ্দরা জানা যায় যে, এসব বুজুর্গদের জামানা কাছাকাছি ছিল।]

আ-মরদ বা কিশোরদেরকে পৃথক রাখা এবং প্রয়োজন ব্যতীত তাদের নিকট বড়দেরকে পৃথক রাখা

তিনি বলতেন যে, দরবেশদের খানকার শায়খের জন্য মুনাসিব নয় যে, তিনি কিশোর বা আ-মরদদেরকে খানকায় স্থান দিবনে। যখন তাদের কারণে তথায় দরবেশদের মাঝে বিপর্যয়ের আশংকা হবে। বিশেষ করে যখন আমরদ সুশ্রী ও কমনীয় হবে তখন।

কিন্তু যদি এমন কিশোর হয় যে, ফিতনা-ফাসাদ থেকে পৃথক থেকে আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকে, ক্রীড়া-কৌতুক, হাঁসি ঠাট্টা করার জন্য তার ফুরসত না থাকে, তবে এক শর্তে তাকে খানকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে যে, শায়খ নিজেই তার যাবতীয় জরুরী খিদমতের আনজাম দিবেন।

খানকার ব্যবস্থাপকের নিকট সমর্পণ করবেন না। হ্যাঁ, যদি খানকার ব্যবস্থাপক আপন নফসের প্রতি ক্ষমতাবান হয় ও তার প্রতি কোন প্রকার ন্যাক্কারকজন কার্য সংঘটিত হওয়ার আশংকা না থাকে, তখন তার হওয়ালা করা যেতে পারে। তিনি আরো বলতেন যে, কিশোরদের জন্য উচিত নয় মজলিসে বড়দের মাঝখানে বসা, বরং মজলিসের এক পাশে বসবে ও তাদের দিকে চেহারা ফিরায়ে বসবে না। আর কোন দরবেশের সাথে সম্পর্ক করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়ী-মোচ ভাল করে না উঠবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেনঃ উল্লেখিত যতগুলো স্থানে তাদেরকে বড়দের সাথে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে-এতো ছিল পূর্বের মাশায়েখগণের জামানার কথা, কিন্তু আজ-কাল এই সব আহ্কাম ব্যাপকরূপ ধারণ করেছে সুতরাং নেকবখ্ত কিশোর এবং নেকবখ্ত দরবেশ কেউ এ আহ্কাম থেকে বাদ পড়বে না। বরং সবাইর জন্য আহ্কাম সমভাবেই প্রযোজ্য হবে। যেমন কবি বলেন ঃ

هرگز بگندمی گون لاتقر بوا که زهراست

حال پدر بیاداز ام البتاب دارم

অর্থ ঃ গৌরবর্ণের কারো কাছে যেয়ো না কভু

যেহেতু এ বিষসম প্রাণনাশা,

আমাদের সে আদি পিতার সংবাদ দিয়েছে

কোরআন। স্বয়ং তা -যে কত সর্বনাশা ।

হযরত শায়খ আবু মাসউদ ইবনে আবীল আশায়ের (মৃত-৬৪৪ হিঃ) – এর বাণী ঃ

যে সকল বস্তু আল্লাহর যিকির থেকে সরিয়ে রাখে যদিও উহা দূরের হয় তবুও তার থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

তিনি বলতেন যে, তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য যে, ঐ সকল জল্পনা কল্পনার উৎস ছিন্ন করা, যা তোমাদেরকে নিজের কাজে মশগুল করে দেয় এবং যদ্বারা তোমাদের মনে দুনিয়ার মহব্বত সৃষ্টি হয়। যখন এ ধরনের কোন খেয়াল জাগ্রত হয়, তখন তার থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহর যিকিরে মনোনিবিশ কর।

তিনি আরো বলতেন তোমরা এ থেকেও বেঁচে থাক যে, অন্তরে যে সব ওয়াসওয়াসা খারাপ কল্পনা জাগ্রত হয় সেগুলোকে মনের মাঝে গেঁথে নেওয়া ও অন্তরে স্থান দেওয়া থেকে। কেননা, কলবে যখন ওয়াসওয়াসা ও কু-ধারণা প্রবল হয়ে যায়, তখন একটি চিন্তা ফিকিরের সূচনা হয়ে যায় এবং অনেক সময় ইচ্ছা ইরাদা জোরাল হয়ে যায়। ফলে তা কলবের উপর প্রবল হয়ে পড়ে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন কলবের উপর নফসের প্রভাব বেড়ে যায়, তখন কলব দুর্বল হয়ে যায়। বা আকলের উপর একটা পর্দার মত কিছু পড়ে যায়।

আল্লাহর নৈকট্যলাভের উছিলাগুলোকে গণীমত মনে করা যদিও উছিলাগুলো অনেক দূরবর্তীর হয়

তিনি বলতেন যে, বান্দার জন্য কর্তব্য আল্লাহ তা'লার যাতের সাথে এমনভাবে মনোনিবেশ করা, যেন আল্লাহ ব্যতীত আর সব কিছুই ভুলে যায়। আর যদি এটা সম্ভব না হয়, তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখার অবস্থা সৃষ্টি করবে। যদি এটাও সম্ভব না হবে, তবে কমপক্ষে আল্লাহ তা'আলার অনুগত্যের মাঝে মনোনিবেশ করে থাকবে।

আল্লাহর অনুগত্য না করতে পারা আমার নিকট গ্রহণীয় কোন উযর নয়। কারণ, এ স্তর তো হল তরক্কীর সবচেয়ে নীচের স্তর।

মুজাহাদার সহজ পদ্ধতি

তিনি বলতেন, সালিক বা আধ্যাত্মিক সাধকের জন্য ওয়াজিব যে, যখন নিজের নফসের মধ্যে কোন প্রকার কু-স্বভাব উপলদ্ধি করবে। যেমন, রিয়া তাকাব্বরী কার্পণ্য, অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অশুভ ধারণা ইত্যাদি। তখন তার জন্য কর্তব্য হল, নফসের উল্টা করা। যেমন কারো সাথে তাকাব্বরী থাকলে, তাকে দেখলে তাওয়াজু বা বিনয় ও নম্র ব্যবহার করা। যদি নিজের মাঝে কার্পণ্য উপলব্দি করে তবে দান সদকা করা ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। তাঁর দেওয়া শক্তি–সামর্থ দিয়ে রিযাযত মুজাহদা করা এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা দ্বারা আখলাকে রজিলা বা গর্হিত চরিত্র কমজোর হয়ে যাবে এবং কলবের নূর বৃদ্ধি হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের তাকে এমন এক শক্তি দান করবেন যদ্বারা আল্লাহর প্রতি মহব্বত প্রবল হয়ে যাবে এবং যাবতীয় অনিষ্টকারী বস্তু অনায়াসেই পরিহার করবে। ফলে খাহেশাতে নাফসানী বিনা মুজাহাদায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

নফসের হক আদায় করা কর্তব্য, কিন্তু শরীয়তের সীমা অতিক্রম থেকে বিরত রাখা অপরিহার্য ঃ

তিনি সুদীর্ঘ এক আলোচনায় বলেছিলেন যে, সাধকগণ তার নফসের হক আদায় করা উচিত। যেমন – পানাহার ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ইত্যাদি। কিন্তু নফসকে এমন জিনিস থেকে দূরে রাখবে যা তাকে শরীয়তের সীমারেখা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। কেননা, মানুষের নফস মানুষের নিকট আল্লাহর একটি আমানত ও একটি বাহন, যার উপরে আরোহণ করে সাধক সাধনার রাস্তা অতিক্রম করে।

আল্লাহর ধ্যানে থাকার বরকত

তিনি এরশাদ করেন যে, আল্লাহ তা'আলার ধ্যানই সকল কল্যাণ ও পূণ্যের চাবিকাঠি এবং ইহাই আরাম ও সুখ–শান্তির রাস্তা। আর এর দ্বারা কলব বা অন্তর পবিত্র হয় ও নফস কমজোর হয়। আর খোদার সাথে

সম্পর্ক বেশী হয়। ফলে অন্তরের মাঝে খোদার প্রেম সুদৃঢ় হয়ে হৃদয়ে সত্যনিষ্ঠা অর্জিত হয়।

আর এ সত্যনিষ্ঠা এমন এক প্রহরী যে ঘুমায় না (অর্থাৎ অতন্দ্র প্রহরী) ও এমন এক ব্যবস্থাপক যে, অলসও নয়।

নফসের মোকাবিলায় সীমালংঘন না করা

তিনি এরশাদ করেছেন, সাধকের জন্য ওয়াজিব যে, নফসের বিরুদ্ধাচরণ ও মোকাবেলায় একবারে লেগে না থাকা চাই। কেননা, যে ব্যক্তি নফসের বিরোধিতায় একেবারে মগ্ন হয়ে যাবে, নফস তাকে উন্নতির সোপান থেকে বিচ্যুতি করে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখবে।

আর যে ব্যক্তি নফসকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেবে। নফস তার উপর সওয়ার হয়ে যাবে। বরং নফসকে এভাবে ধোঁকা দেওয়া চাই যে, তাকে কিছুক্ষণ স্বাভাবিকভাবে আরাম দিবে অতঃপর আস্তে আস্তে কমাতে থাকবে।

আর যেই ব্যক্তি নফসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একবারে ওৎপ্রোত ভাবে মগ্ন হয়ে যাবে, নফস তাকে তার কাজে মশগুল রাখবে। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নফসকে কৌশলে বশীভূতঃ করে শৃংখলিত ও বন্দী করে রাখবে এবং নফসের খাহেশের পিছনে পড়বে না, তখনই তার নফস তার নিকট অনুগত হয়ে যাবে।

হযরত ইবরাহীম ওয়াসূকী কুরশী (রহঃ) (মৃত ৬৭৬-হিঃ) – এর বাণী ঃ

যাবতীয় অসার কার্যলাপ ও কথাবর্তা থেকে বিরত থাকা মুরীদের জন্য কর্তব্য ঃ

তিনি বলেছেন যে, যে পরিমাণ ইল্‌ম অর্জন করলে ফরয, ওয়াজিব যথাযথভাবে আদায় করা যায়, সে পরিমাণ ইল্‌ম হসিল করা মুরীদের জন্য ওয়াজিব। কিন্তু ভাষা সাহিত্যের মাঝে মনোনিবেশ করবে না। কেননা ইহা মুরীদকে তার লক্ষ্য –উদ্দেশ্য থেকে অনমনোযোগী করে রাখে। বরং

তার জন্য কর্তব্য হল যে, আমলের ক্ষেত্রে, আল্লাহর ওয়ালীগণের জীবন চরিত্র অনুসন্ধান করা ও যিকিরে মশগুল থাকা।

শায়খের প্রয়োজনীয়তার কারণ

তিনি এরশাদ করেন যে, মানুষ যদি কু-প্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে যেত এবং আল্লাহ্‌র বিধান সম্পূর্ণরূপে মেনে চলত, খোদার কসম ,কোন শায়খের প্রয়োজন হত না। কিন্তু তারা এ পথ প্রবেশ করে ব্যধিগ্রস্ত ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

শায়খের আনুগত্য পরিহার্য হওয়া

তিনি বলেছেন – শায়খ মুরীদের জন্য চিকিৎসক তুল্য। তাই যে রুগী চিকিৎসকের কথামত কাজ করবে না তার নিরাময়ের আশা করা যায় না।

অযোগ্যদের আনুগত্যর সম্মুখে বাণী প্রচার না করার নিষেধাজ্ঞা

তিনি বলতেন, হে প্রিয় বৎসগণ! তোমরা এমন সব লোকের সামনে বর্ণনা করবে যারা আমাদের তরীকার অন্তর্ভূক্ত ও আমাদের তরীকায় চলতে ভালবাসে। আর এমন সব লোকের নিকট প্রচার করবে, যারা আমার কথা নির্দ্ধিধায় মেনে নেবে। কিন্তু এ ধরনের লোক ব্যতীত অন্য কোন লোকের সামনে আমার কথা প্রচার করবে না। কেননা অযোগ্যদের সামনে আমাদের বাণী প্রচার করা জুলাপ খাওয়ানোর ন্যায়। (তাই একে গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয়।)

খিলওয়াত বা নির্জনতা ফলপ্রসু হওয়ার পূর্ব শর্ত

তিনি বলতেন যে, খিলওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণকর হবে না, যতক্ষণ না উহা শায়খের পরামর্শ অনুযায়ী হবে। অন্যথায় খিলওয়াতের লাভ থেকে ক্ষতিই বেশী হবে।

হাকীকত ব্যতীত শুধু রীতি –নীতিতে পরিতুষ্ট না থাকা

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি সূফী –সাধকগণের পোশাক পরিচ্ছদ ও রীতি নীতি গ্রহণ করে, ইহারা তাকে কোন ফায়দা দিবে না। কেননা, এটা শুধু

বাহ্যিকতা মাত্র। কিন্তু সুফী–সাধকগণ জাহের –বাতেন সর্বপ্রকার আমলই একত্রিত করেছেন। তম্মধ্যে বাতেনকেই প্রধান্য দিতেন। কেননা তাঁরা এর দ্বারাই কামলিয়াতের শীর্ষ স্থানে উপণীত হয়ে থাকেন। আমি কখনো এরূপ দেখিনি যে, শুধুমাত্র খেরকা পরিধান করেই অথবা সনদ লাভ করে আমলিয়াতের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছে। বস্তুতঃ উহা তার তরক্কীর পথে অন্তরায় যে পথের কোন শেষ নেই। তাই কবি বলেন।

اۓ برادرهے نہا یت زگے است –

هرچه بروۓ مى رسى بروۓ مأ يست

অর্থাৎ, প্রিয় বৎস ! সীমাহীন সে দরবার, সে পথে অগ্রসর তুমি যতই হওনা কেন অসম্পূর্ণতা থেকেই যাবে।

এ যুগে তরবিতের লাভ নগন্য

তিনি এক সুদীর্ঘ বাণীর ইতি টেনে বলনে যে, আহ্‌লূল্লাহ্‌দের বর্তমান এ কাজটি যে, তাঁরা সর্বসাধারণে ইসলাহ্‌ ও তরবিয়তের প্রতি সুনজর রাখেন না, বরং তাদের জন্য শুধুমাত্র দেখা করাটাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইহা প্রমাণ করে যে, বর্তমান যুগে সুলূকের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কেননা লোকদের সংশোধন ও ইছ্‌লাহ্‌ এর ফিকির দরবেশগণকে আপন উদ্দেশ্য থেকে গাফিল করে দেয়। তদুপরি ইহা দ্বারা কোন সুফলও অর্জিত হয় না। যা পরীক্ষিত।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, তালিবে সাদেক যে মুজাহাদার জন্য প্রস্তুত উক্ত বাণী থেকে পৃথক, যদিও তার স্যংখ্যা বর্তমানে নগন্য।

হযরত শায়খ সাউদ কবীর ইবনে মাখিল্লা (রহঃ) -এর বাণী ঃ

(তিনি কোন যুগের লোক ছিলেন তা জানা নেই। কারো জানা থাকলে সংযোগ করে দিবেন।)

তিনি বলতেন যে, মানুষের নিকট থেকে পৃথক হয়ে নির্জনে আস্তানা স্থাপন করে স্বীয় হালাত গোপন করা, এটা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়; বরং মানুষের সাথে মেলা–মেশা ও প্রকাশ বিকাশ থেকে আপন হালাত গোপন করাই হল চরমোৎকর্ষ সাধনা বা পূর্ণ কৃতিত্ব অর্জন। কেননা কামিল ব্যক্তিগণ স্বীয় উচ্চ মর্যাদা উপমীত হওয়ার দরুন মানুষের নিকট আপন হালত গোপন রাখতে অক্ষম ।

শ্রেষ্ঠ তরবিয়ত

তিনি এরশাদ করেছেন যে, কামিল ঐ ব্যক্তি নয় যে, তোমাদেরকে শুধু ঔষধের সন্ধান দেয়। বরং কামিল ঐ ব্যক্তি যে নিজের সামনে তোমাদের চিকিৎসা করে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেনঃ এর কারণ হল, ঔষধের নাম বর্ণনা করে দেওয়া তো কোন মুশকিল কাজ নয়, এতো সবাই বলে দিতে পারে। কিন্তু নিজের সামনে রেখে চিকিৎসা করা ঐ ব্যক্তিরই কাজ যে দুঃসাহসী ও পারদর্শী । আল্লাহ্‌ তা'আলার আদত হল যে, উহার উপর ফায়দা অবশ্যই হয়ে থাকে।

মকবুল ইলমের মাহাত্ম্য

তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌ যখন তাঁর কোন বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তিনি তাকে ইল্‌মে মারেফাত এমনভাবে দান করেন যে, তখন তার উপর যুক্তি কিংবা শরীয়তের বাহ্যদৃষ্টি কোন দিক থেকেই আপত্তির সুযোগ থাকে না।

তরীকতের কোন কোন নিগুঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করা নিষেধ

তিনি বলতেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এমন নিগুঢ়তত্ত্ব ও রহস্য প্রকাশ করে বেড়ায় যা গোপন করার দরকার এবং এমনভেদ প্রকাশ করে ফিরে যা এলান না করা প্রয়োজন, তাকে দুনিয়ার মধ্যে এ সাজা দেওয়া হয় যে, মানুষ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়। আর কখনো এর চেয়ে কঠোর শাস্তিও প্রদান করা হয়। যেমন হেজাব বা পর্দা পড়ে যাওয়া।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ ধরণের ভেদ বা গুঢ়তত্ত্ব যেগুলো প্রকাশ করা নিষিদ্ধ সেগুলোর নির্দ্ধারণ এ ভাবে হতে পারে, সেগুলো প্রকাশ করে পরে অন্তর সংকোচিত হয়ে আসে।

কিন্তু এ অবস্থা জনগণের আচারণের সাথে সংশ্লিষ্ট জাহরী ইল্‌মের বেলায় সৃষ্টি হয় না। কেননা, যে ইল্‌ম দ্বারা জনগণের সাথে উঠা বসা আদান প্রদান, লেন-দেন ইত্যাকার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা হয়, সে গুলোকে তো দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র মানুষের কাছে প্রচার ও আনুগত্যের উদ্দেশ্য।

বস্তুত ঃ এ ইলমের আওতাভুক্ত হবে শুধুমাত্র ইলমে আসরার ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান ।)

আধ্যাত্মিকতায় শীর্ষস্থানে উপণীত ব্যক্তিও তরবিয়ত থেকে বেনিয়াজ নয়–যদিও তা আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে।

তিনি বলেন যে, শায়খ ও মুসলিহ্ তাঁর চেয়ে বড়দের নিকট তা'লীম ও তার তরয়িতের এত বেশী মুহ্‌তাজ যেমন মুরীদ তার শায়খের নিকট মুহ্‌তাজ।

মুরীদ তার শায়খের নিকট থেকে আপন ভক্তি–ভালবাসা অনুপাতে কল্যাণ লাভ করে থাকে

তিনি বলেন, মুরীদের ক্বলবের মধ্যে নূরের বারিধারা বর্ষিত হয়। তার অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভক্তি অনুপাতে। অর্থাৎ, আপন শায়খের প্রতি যে পরিমাণ হৃদ্যতা, ভক্তি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম হবে, সে পরিমাণ নূর ও ফয়েজ লাভ করবে।

আরিফ খাদিম হওয়া এবং জনগণ তাঁর অনুগত হওয়া

তিনি বলেন, নিজের জন্য আরিফ নন, বরং জগৎবাসীর জন্য আরিফ। আর জগৎতবাসী নিজের জন্য নয়; বরং আরিফের জন্য । অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আরিফের অন্তরে খিদমতে খালকের অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেন, ফলে তিনি সদা -সর্বদা জগদ্বাসীর কল্যাণ কামনায় মগ্ন থাকেন । আর এদিকে জগদ্বসীর হৃদয়ে তাঁর খিদমত ও আনুগত্যের প্রেরণা আল্লাহ্ সঞ্চার করে দেন।

আল্লাহ্ অভিমুখী ও সৃষ্টি অভিমুখী হওয়ার নিদর্শন

তিনি বলতেন, বান্দা যখন আপন ক্বলব আল্লাহ্ অভিমুখে করে তখন উহা স্থীর হয়ে যায়। অস্থিরতা ও চঞ্চলতা দূর হয়ে যায়। কিন্তু বান্দা যখন সৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন ক্বলব পেরেশান ও অস্থির হয়ে যায়।

নিজের থেকে নিম্নশ্রেণীর লোকের তরবিয়ত পদ্ধতি

তিনি বলেন," আরিফ" এর জন্য অপরিহার্য যে, আপন সুউচ্চ সোপান থেকে মুরীদদের স্তরে দিকে নেমে আসা। তাহলে মুরীদদের তরবীয়তে সক্ষম হবে। অর্থাৎ মুরীদ শায়েখের হালত নিজের তুলনায় কিছুটা নিকটবর্তী যদি দেখতে পাবে, তখন তার সেগুলো হাসিল করার উদ্দীপনা জাগ্রত হবে এবং চেষ্টা ও সাধনা করবে। আর যদি মুরীদ শায়েখকে অনেক উচ্চ স্তরে দেখতে পায় তবে সে হিম্মত হারা হয়ে যাবে।

প্রকৃত পক্ষে মুরীদ উপকৃত হওয়ার জন্য শায়েখের সাথে সম্পর্ক ও মুনাসিবাত শর্ত, আর মুরীদ শায়েখের উচ্চ মকাম থেকে অনেক দূরে। সুতরাং মুনাসিবাত ও সম্পর্কের পদ্ধতি হলো যে, শায়েখ নিজের স্তর থেকে অবতরণ করে তরবিয়ত করা। যেমন একজন বড় আলেম মীযান নামক কিতাব খানির পাঠ দান করার সময় মীযান পাঠকের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। (অনুরূপ ভাবে এখানেও শায়েখ মুরীদের যোগ্যতার প্রতি নজর রাখবে।

অনেক লোক সাহেবে কেরামত নন কিন্তু সাহেবে কেরামত থেকে শ্রেষ্ঠ

তিনি বলেন যে, কোন সময় দেখা যায়, একজন আরিফ জলযানে আরোহন করেন, কিন্তু তাঁর পাশে অনেক ওলী –আল্লাহ দরবেশ কারামত দ্বারা নৌকা ব্যতীত পানি অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এসব কেরামত উক্ত আরিফ থেকে ফয়েজ ও ইল্‌ম হাসিল করে থাকে। অথচ ঐ আরিফের অবস্থা হলো যে, তিনি যদি তাদের সাথে পানিতে নেমে পড়েন তবে তিনি ডুবে যাবেন। (কেননা তিনি সাহেবে কেরামত নন।)

কোন অবস্থার উপর পরিতুষ্ট না হওয়া উন্নতির নিদর্শন এবং সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া অবনতির নিদর্শন

তিনি বলেন যে, তরীকতে হাকীকত হলো যে, তোমরা সর্বদা মুফলিস বা গরীব থাকবে (অর্থাৎ অনার্জিত বিষয় বস্তুকে হাসিল করার আকাংখায় থাকার হিসেবে) এবং তোমরা সর্বদা আল্লাহর তলবে থাকবে। কিন্তু যখন তোমরা মনে করবে যে, আমি আল্লাহকে হাসিল করে ফেলেছি তবে মনে রাখবে যে, তুমি আল্লাহকে হাসিল করতে পারনি।

আর যখন তোমর ধারণা জন্মাবে যে, আমি কামিয়াব হয়েছি, তখরন জেনে রাখ যে, তুমি কামিয়াব হতে পারনি। আর যদি মনে কর যে,তোমার কোন হালত অর্জিত হয়ে গিয়েছে, তবে মনে রাখবে যে তুমি কোন হালই অর্জন করতে পারনি।

হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে জব্বার নফরী (রহঃ)-এর বাণীঃ

(উক্ত বুযুর্গ হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী (রহঃ)- এর যুগেরও আগের বুযুর্গ ছিলেন।)

আল্লাহ তা'আলার মহাক্রোধের নিদর্শন

তিনি এরশাদ করেছেন, যে গুনাহ্ আল্লাহর চরম ক্রোধের কারণ হয় তার নিদর্শন হলো এই যে, সে গুনাহ্‌র পর দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়া। আর যার আগ্রহ দুনিয়ার দিকে বেড়ে যায়, তার জন্য কুফরের দ্বার উম্মুক্ত হয়ে যায়। কেননা, দুনিয়ার ভালবাসা সকল পাপ কর্মের উৎস এবং পাপকর্ম কুফরের দূত বা বাহক। সুতরাং যে, ব্যক্তি ঐ দ্বারে প্রবেশ করবে সে তাতে যে পরিমাণ অগ্রসর হবে সেই পরিমাণ কুফরের অংশ গ্রহণ করবে।

(তবাকাতে কোবরা নামক গ্রন্থের প্রথমাংশের চয়ন এখানেই সমাপ্ত হলো। এর জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহরই)

তবকাতে কোবরার দ্বিতীয়খন্ড থেকে চয়ন

হযরত শায়খ আবুল হাসান শাযলী (রহঃ) (মৃত -৬৫৬হিঃ) -এর বাণী ঃ

কাশফ ও ইলম দলীল নয়

তিনি এরশাদ করেন যে যদি তোমাদের কাশফ্ ও ইল্হাম কোরআন ও হাদীসের বিপরীত হয়, তবে কোরআন ও হাদীসের ইত্তবা করবে এবং কাশফকে বর্জন করবে। আর নফসকে বলে দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, আমি কোরআন ও হাদীসের অনুকরণ দ্বারা গোমরাহী থেকে বিরত থাকব। কিন্তু এ দাযিত্ব গ্রহণ করেননি যে,কাশফ, ইলহাম ও মুশাহাদা অনুকরণেও গোমরাহী থেকে আমাকে হিফাজত করা হবে।

ইস্তেগফারের ফযীলত

তিনি এরশাদ করেন যে, গুনাহ্‌র কারণে মানুষের উপর বিভিন্ন প্রকার বালা-মসিবত নেমে আসে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় দুর্গ হলো এস্তেগফার।

আত্মাত্মিক সংকোচনের কারণ ঃ উহার প্রতিকার ও ধৈর্য

তিনি বলতেন যে, অস্বস্তি ও সংকোচনের কারণ তিনটি। (এক) তোমাদের নিকট থেকে কোন পাপকার্য প্রকাশ হয়ে যাওয়া। (দুই) পার্থিব কোন নিয়ামত তোমদের নিকট থেকে চলে যাওয়া। (তিন) তোমাদের জানমাল ও ইজ্জতের প্রতি কেউ আঘাত হানলে (এসব কারণে অস্বস্তি ও সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়।) সুতরাং যদি তোমাদের কোন গুনাহ্ হয়ে যায়, তবে তার প্রতিকার হলো, তাওবা ইস্তেগফার করা। আর যদি কোন পার্থিব নিয়ামত চলে যায়, তবে আল্লাহর শরাণাপন্ন হও। (অর্থাৎ আল্লাহর নিকট দোয়া কর। যিনি তোমাদিগকে এর পরিপুরক দান করেন।) আর যদি কেউ তোমাদের উপর জুলুম-অবিচার করে, তবে তোমরা তৎপ্রতি ধৈর্য ধারণ করবে। এগুলোই তোমাদের সংকোচতা ও মনক্ষুন্নতা এবং অস্তস্তির ঔষধ বা প্রতিষেধক।

আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সংকোচতার হেতু বা কারণ সমূহের প্রতি অবহিত না করেন তবে তোমরা তকদীরে ইলাহীর প্রতি রাজী

হয়ে নিশ্চিন্ত প্রশান্ত হয়ে যাবে। কেননা তাকদীর অবধারিত হবেই হবে, একথা চিরন্তন সত্য ।

সুন্নতের অনুকরণ–অনুসরণ ব্যতীত "সুলুক" ত্রুটি পূর্ণ থাকে

তিনি বলতেন যে, যদি কোন দরবেশ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে জামাতের পাবন্দি না করে, তবে তার প্রতি কোন আস্থা রাখবে না।

অহংকার তদবীর ও বাতেনী হালতের হিফাজত

তিনি বলতেন যে, যদি তোমাদের কোন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য হালত তোমাদেরকে মোহিত করে এবং তোমরা মনে মনে ঐ হালত চলে যাওয়াকে ভয় কর, তবে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে।

مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –

বিঃ দ্রঃ এই দোয়া পাঠের বদৌলতে তোমাদের বাতেনী হালত নিরাপদ হয়ে যাবে। আর যখন দোয়ার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করবে তখন অহংকারও আসবে না। কারণ এর অর্থ হলো এই যে, যে হালত সৃষ্টি হয়েছে তা তো কেবলমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহেই হয়েছে। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই করতে আমরা সক্ষম নই। সুতরাং আমাদের আবার অহংকার কিসের ?

আধ্যাত্মিকতা সাধনে সাথী সঙ্গী থাকা জরুরী

তিনি বলতেন যে, কোন আলেমের আধ্যাত্মিক সাধানা পূর্ণতায় পৌঁছে না, যে পর্যন্ত কোন নেককার বুযুর্গ সাথী বা কোন হিতাকংখী শায়েখের সান্নিধ্যে না থাকে।

মুসলমানদের দলে থাকা ও তাদের হক উপলব্দি করা

তিনি বলতেন যে, তোমরা মুসলমানদের সাথে থাকাকে লাজিম করে নাও, যদিও তারা ফাসেক গুনাহ্গার হয়। আর তাদের প্রতি শাসন চালিয়ে যাও। (অর্থাৎ তাদের সাথে থাকার অর্থ এ নয় যে, তোমরাও তাদের সাথে পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে যাবে বা তাদের কার্য কলাপের উপর চুপ করে বসে থাকবে, বরং তাদেরকে হেদায়েত করতে চেষ্টা করবে।) [আর তারা যদি সংশোধন না হতে চায় তবে] তাদের সাথে কিছুদিনের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখবে। এটা হবে রহমত ও শফকতের উদ্দেশ্যে' শাস্তির উদ্দেশ্যে নয়।

"কারামত" কামনা করার নিন্দা এবং সবচেয়ে বড় কারামত কি?

তিনি এরশাদ করেছেন যে, কারামত ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হয় না। যে ব্যক্তি তা কামনা করে বা যার অন্তরে কারামতে আশা সঞ্চারিত হয়। অথবা যে কারামত হাসেল করার জন্য আমল করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে কারামত এমন ব্যক্তিরই হাসেল হয়, যে নিজের আমলকে কিছুই মনে করেনা। আল্লাহ্ তা'আলার রেজামন্দীর পেছনে লেগে আছে ও তাঁর অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকে। তিনি বলতেন যে, ঈমান ও ইত্তেবায়ে সুন্নত থেকে বড় কোন কারামত নেই। যার এ কারামত হাসিল হয়ে গিয়েছে অতঃপর সে আরো আরো কারামত হাসিলের প্রতি আগ্রহী হয়, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী; ঈমান ও ইত্তেবায়ে সুন্নতের উপর তুচ্ছ বিষয়কে সে প্রাধান্য দেয় ? অথবা সে সহীহ্ ইলম্ বুঝার মধ্যে ভুল করেছে। যার কারণে সে ভুল আকীদায় লিপ্ত।

সে ব্যক্তির উপমা এরূপ ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এক ব্যক্তিকে বাদশাহ্ তার নৈকট্য লাভের মর্যাদায় ভূষিত করেছে ? অতঃপর সে শাহী ঘোড়ার সহিস হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে।

প্রতিরোধ স্পৃহা তরীকতের পরিপন্থী

তিনি বলেন যে, ওলীর মধ্যে এটাও একটা সূক্ষ্ম কাম রিপু যে, এ আশা পোষণ করা যে, জালিমের উপর তার শক্তি অর্জিত হোক।

আরিফ জায়েয আনন্দ উপভোগে সংকুচিত হয় না

তিনি বলেন যে, আরিফ বিল্লাহ্ জায়েয আনন্দদায়ক জিনিস দ্বারা সংকুচিত হননা। কারণ, সর্ব সময় তিনি আল্লাহার সান্নিধ্যে থাকেন। ঐ জিনিসের মধ্যেও তিনি আল্লাহর সাথে যা তিনি গ্রহণ করেন এবং ঐ জিনিসের মধ্যেও যা তিনি বর্জন করেন। কিন্তু এ আনন্দ যদি গুনাহ্ হয় তবে বিভিন্ন কথা।

হযরত থানবী (রঃ) বলেন, কিন্তু যাহেদ ব্যক্তি জায়েয আনন্দদায়ক বস্তু থেকে সংকুচিত বোধ করেন। কেননা, তার লক্ষ্য হচ্ছে সরাসরি নফসের অবস্থা। সে চিকিৎসার প্রতি। যদিও সে চিকিৎসার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভই উদ্দেশ্য থাকে।

অধিক মুরীদের লোভ করা ঘৃণিত কাজ

তিনি বলতেন, একজন মুরীদ যে তোমার আধ্যাত্মিক মর্ম বুঝে, সে ঐ ধরণের সহস্র সহস্র মুরীদ অপেক্ষা উত্তম, যারা এ যোগ্যতা রাখে না।

বুযুর্গদের সমালোচনার পরিণতি

তিনি বলেছেন – যে ব্যক্তি সূফী সাধকের অবস্থা সমালোচনা করে, সে অবশ্যই মৃত্যুর পূর্বে তিন প্রকার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। (এক) মওতের জিল্লত অর্থাৎ মান-সম্মান ইজ্জত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । (দুই) দারিদ্র ও অভাব অনটনের মৃত্যু (অর্থাৎ মহা দারিদ্র সংকটের পতিত হবে।) (তিন) অপরের প্রতি মুহতাজ হওয়া (অর্থাৎ মানুষের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হবে।) কিন্তু কেউ তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে না।

শায়খ আহমদ আবুল আব্বাস মুরআশী (রহঃ) (মৃত–৬৮৬ হিঃ) –এর বাণী ঃ

যার নেক্‌কার মুরীদ আছে তার জন্য কিতবা রচনা নিস্প্রয়োজন

তিনি বলতেন যে, আমার কিতাব হলো আমার মুরীদ সকল।

সকল কামনা–বাসনা বর্জন করা

তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি পছন্দ করে সে সুখ্যাতির গোলাম এবং যে ব্যক্তি গুমনামী ও লুকিয়ে থাকার কামনা করে সে গুমনামীর গোলাম। প্রকৃত পক্ষে যে আল্লাহার গোলাম তার নিকট উভয়টিই সমান। চাই আল্লাহ তাকে সুখ্যাতি দান করেন, চাই গুমনামীই দান করেন।

বাতেনী তরীকার বরকত জাহেরী ইল্‌মে প্রকাশ পায়

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বুজর্গানে দ্বীনের ছোহবতে থাকে এবং সে ব্যক্তি ইলমে জাহেরীরও আলেম, তবে তার এ ইল্‌ম সে ছোহবতের ফলশ্রুতিতে আরো অধিক উজ্জল ও রওশন হয়ে যায়।

"মুরীদের অন্তরে শায়খের স্থান হওয়া " শায়খের অন্তরে মুরীদের স্থান হওয়া অপেক্ষা অধিক কল্যাণজনক ঃ

তিনি বলেন যে, তোমরা শায়খের নিকট দাবী করোনা যে, তোমরা তার অন্তরে আসন পেতে রাখবে। সুতরাং তোমরা যে পরিমাণ শায়েখকে

আপন অন্তরে স্থান দেবে সে পরিমাণ শায়খও তোমাদেরকে তার অন্তরে স্থান দেবেন।

দুনিয়া প্রীতির নমুনা

তিনি বলেন, দুনিয়া প্রীতির আলামত হল, মানুষের কুৎসা রটনাকে ভয় করা এবং তাদের প্রশংসা ও স্তুতিকে ভালবাসা। কেননা, যদি সে প্রকৃতপক্ষে যাহেদ হত, তবে না সে কুৎসা রটনাকে ভয় করত এবং না প্রশংসা করাকে ভালবাসত।

আরিফ জনসাধারণের মজলিসে বসার জন্য অস্থির হওয়া

তিনি বলেছেন, খোদার কসম, আমি জনসমাবেশে তখনও পর্যন্ত বসিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাকে ভয় দেখানো হয়েছিল যে, তুমি যদি মানুষের কল্যানার্থে মজলিস না কর, তবে তোমাকে যে দৌলত দেয়া হয়েছে উহা ছিনিয়ে নেয়া হবে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, অনুরূপ অবস্থা সকল বুজর্গানে দ্বীনেরই, যদি তাঁরা মানুষের উপকার না করেন, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ফয়েজ স্থগিত হয়ে যায়।

ওযীফাসহ সকল বিষয়ে মুরীদকে তার আপন রায় থেকে ফিরিয়ে রাখা

উক্ত শায়খের অভ্যাস ছিল যে, যদি কোন মুরীদ দেখতে পেতেন যে, সে আপন ইচ্ছা ও রায় অনুযায়ী সামান্যটুকু আমল শুরু করে দিয়েছে। তখনই তাকে তিনি ঐ ওযীফা ও আমল থেকে বারণ করতেন।

মানুষের সাথে ততটুক মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার কর, যতটুকু আল্লাহর সাথে তার রয়েছে।

তাঁর চিরাচরিত নিয়ম ছিল যে, আগন্তুক ব্যক্তিকে ঐ পরিমণ সম্বর্ধনা দিতেন, যে পরিমাণ মর্যাদা তাঁর আল্লাহর নিকট রয়েছে বলে উপলব্ধি করতেন। কেননা এ পদ্ধতির দ্বারা ঐ বিষয় আঁচ করে নিতেন যে, আপন ইবাদতের প্রতি তার দৃষ্টি রয়েছে। আবার কোন সময় এরূপও দেখা যেত যে, তিনি যদি আঁচ করতে পারতেন যে, কোন গুনাহগার পাপী বান্দা তার নেহায়েত বিণয় ও লজ্জিত হয়ে আসতেছে তখন তিনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন ।

শায়খ ও মুরীদের পাস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

তিনি বলতেন যে, মুরীদদের অবস্থার খোঁজ-খবর নেওয়া মাশায়েখদের উচিত এবং মুরীদদের জন্যও ইহা জায়েজ যে, নিজের সমস্ত বাতেনী হালত শায়খের নিকট প্রকাশ করা। কেননা শায়খ হলেন ডাক্তার সমতুল্য। আর মুরীদ হল সতর বা গুপ্ত অঙ্গের ন্যায়। প্রয়োজন বশতঃ চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের সামনে গুপ্ত অঙ্গ খুলে দেখাতে হয়। পক্ষান্তরে যে মুরীদ শায়খের নিকট নিজের কোন অবস্থা গোপন করে, সে তার নিকট অপরিচিত জনের ন্যায় যে, একে অপরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

খোদাভীতি ও খোদাপ্রীতির মান কিরূপ হওয়া প্রয়োজন

তিনি আপন শায়খের বাণী বর্ণনা করেন যে, যখন তোমাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তোমার মধ্যে খোদার ভয় আছে কি, না নেই ? তখন উত্তরে তুমি বলবে, জী হ্যাঁ আছে। তবে যতটুকু আল্লাহ আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ততটুকু করা হয়, অনুরূপ যদি তোমাকে খোদা প্রীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তবে এ ধরণের উত্তরই প্রদান করবে। কেননা যদি তুমি শুধু বল দাও যে, হ্যাঁ আছে, তবে এর মাঝে তোমার একটি দাবী প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর যদি বল যে না, তবে এটা বে-আদবী ও না শুকুরী হবে।

আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত পন্থায় চলে, তাকে পরীক্ষা করা হবে না। কেননা, সে আল্লাহর উপর ভরস করেছে, নিজের নফসের উপর ভরসা করেনি।

আল্লাহর উপর আশা-ভরসা ও ভয়-ভীতির ব্যাপারে আলেম ও সাধারণ লোকর মধ্যে পার্থক্য

তিনি বলতেন, সাধারণ লোকের অবস্থা হল যে, যদি তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখান হয়, তবে তারা শুধু ভয়ই করতে থাকে। যদি তাদেরকে আল্লাহ্র রহমতের আশা ও সান্তনা দেওয়া হয়, তখন তারা কেবল আশান্বিত ও আনন্দিত হতে থাকে।

পক্ষান্তরে আলেমের অবস্থা তাঁদের বিপরীত। যদি তাদেরকে ভয় দেখানো হয়, তখন তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রতি আশাবদী হয়। আর যখন তাদেরকে আশা দেওয়া হয়, তখন তারা ভয় করতে থাকে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন এর রহস্য এই যে, ভয়ের সময় তাদের অন্তর থেকে আশা দূর হয় না এবং আশার সময় ভয় দূর হয় না। কিন্তু সাধারণ লোক এর বিপরীত যে,তাদের অন্তরে দ্বিতীয় দিকটি থাকে না।

হযরত আলী ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) (মৃত-৮০১ হিঃ) - এ বাণীঃ ভয়ের সাথে বে-আমলী ঐ আমল থেকে উত্তম যার মধ্যে দাবী রয়েছে

তিনি বলেন যে, ঐ নামায যার ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, তাদ্বারা বুজুর্গী এবং মকবুলিয়াত এর দাবী মনে বা মুখে আসে, তবে উহা রিয়া-গর্ব এবং আহাম্মকী বেকুবী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পক্ষান্তরে ঐ ঘুম যার অন্তরে ভয় ভীতি নিহিত উহা মূলত ঃ দ্বীনেরই মদদগার।

ফিকাহ বিশারদদের প্রয়োজন এবং সূফী সাধকদের প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য

তিনি বলেন যে, জাহেরী আলেমগণ যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমরা সূফী - সাধকদের নিকট থেকে কি ফায়দা হাছিল করেছ ? তখন তোমরা বলবে যে, যে সকল কথাবার্তা ও মাসআলা দ্বীন সম্পর্কে আপনাদের নিকট থেকে শিখেছি, সেগুলোর উপর ভালভাবে আমল করা তাঁদের নিকট থেকে শিখেছি।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মানুষ যদিও উলামায়ে জাহের থেকে আমলী কামাল অর্জন করেনি তবুও তার জন্য একথা ঠিক হবে না যে, ফকীহ্ ও আলেমের প্রয়োজন নেই। কেননা উত্তম আমলের পূর্বে ছহীহ ইল্‌মের প্রয়োজন রয়েছে; আর ছহীহ্ ইল্‌ম ঐ আলেমদের নিকট থেকে অর্জিত হয়।

রীতিনীত বা অভ্যাস ক্রিয়া এবং ইবাদতের ফলাফল

তিনি বলেন যে ব্যক্তি নিজের আখলাখের মালিক হয়ে গিয়েছে, (অর্থাৎ আখলাককে নিজের আয়ত্বে নিয়ে এসেছে।) সে ব্যক্তি নিজের হিস্যার সব অংশকে বশীভূতঃ করে ফেলেছে।

আর যে ব্যক্তির আখলাক তার মালিক হয়ে গিয়েছে, (অর্থাৎ যে আখলাককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি।) সে আপন হিস্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে।

বিঃ দ্রঃ এ কথার সারমর্ম এরূপ মনে হয়। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।) যে, যে ব্যক্তি নিজের আখলাক নিজ আয়ত্বে নিয়ে এসেছে, সে সকল স্বভাব ও সকল হালতের হক পুরোপুরিভাবে পালন করেছে। কিন্তু যে ব্যক্তির উপর তার আখলাক প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্ভবতঃ এক স্বভাব বা এক হালতের নিকট পরাজয় বরণ করে অপর হালত বা অপর স্বভাবের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে না।

এ জন্য প্রথম ব্যক্তি পূর্ণ হিস্যার মালিক হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি তা পারেনি।

তিনি আরো বলেন যে, যে সকল আচার আচরণ কার্যকলাপ নফসের উপভোগের উদ্দেশ্যে হয় সেগুলোকে আদত বা অভ্যাস বলা হয়। আর যে সকল কার্যকলাপ শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, সেগুলোকে ইবাদত বলা হয়। যেমন নামায, রোযা ,ঘুম নিদ্রা, পানাহার ইত্যাদি –এ গুলো সবই আরিফ বিল্লাহ্র নিকটে ইবাদতে পরিগণিত।

তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তির আদত তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার ইবাদত -বন্দেগী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আদত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে, সে ব্যক্তিই আরিফ ।

হযরত শায়খ আবুল মাওয়াহিব শাজলী (রহঃ) –এর বাণী ঃ

(বর্ণিত আছে, তিনি ৮২৫ হিঃ সনে রাসুলে মাকবুল (সঃ) – এ জিয়ারত করেছিলেন। এ থেকে মনে হয় তিনি ঐ যুগেরই মানুষ ছিলেন।)

অহংকারীর চিহ্ন

তিনি বলেন যে, অহংকারীর আলামত হল যে, যখন তার প্রতি কোন দোষারূপ করা হয়, তখন সে তার প্রতিউত্তর দিতে থাকে। (অর্থাৎ দোষ স্খলনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়) আর যখন তার সামনে কোন বুযর্গের প্রশংসা করা হয় তাঁর কুৎসা রটনা করে।

খিলওয়াত নশীনি বা নির্জনতা অবলম্বনের শর্ত

তিনি বলতেন যে, আমাদের আলেমগণের অভিমত হল যে, নির্জনতা ঐ ব্যক্তির জন্য শোভনীয় যিনি ইলমে শরীয়েত পরিপক্কতা অর্জন করেছেন।

কারো কারো খিদমত শায়খদের নিকট কষ্টদায়ক হয়, আবার কারো খিদমত কষ্টদায়ক না হওয়ার কারণ

তিনি বলতেন যে, কোন কোন দরবেশের শারীরিক বা আর্থিক খিদমত মাশায়েখদের নিকট পীড়াদায়ক ও অপছন্দনীয় হয় ; তার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে,তার অন্তরে কোন রোগ বা খারাপী রয়েছে, যেটাকে সে শায়েখের নিকট গোপন রেখেছে।

এ কারণে কোন সময় এমনও দেখা গিয়েছে যে তিনি কোন কোন দরবেশকে তাঁর খিদমত করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

স্বপ্নের কারণে গর্বিত না হওয়া

তিনি বলতেন যে, তোমরা যখন স্বপ্ন মাধ্যমে কোন সুসংবাদ দেখ, তখন তোমরা নিজের নফসের প্রতি গর্ববোধ করবে না।

যে পর্যন্ত তোমরা একথা জানতে না পারবে যে, আল্লাহ্ এর প্রতি রাজী আছেন। আর একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, স্বপ্ন মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনিশ্চিতই থেকে যায়।

হযরত শায়খ সুলাইয়মান যাহিদ (রহঃ) –এর বাণীঃ

(তিনি ৮২০ হিঃ সনের কিছু পরে পরলোক গমণ করেন।)

মুরীদের ন্যায় নিষ্ঠার পরীক্ষা

তাঁর নীতি ছিল যে, বাইয়াত করার এক বছর বা তার চেয়ে কিছু বেশী কাল পর্যন্ত মুরীদকে তিনি পরীক্ষা করতেন।

পরিচালনা ক্ষেত্রে মুরীদ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা

মুরীদ থেকে কোন কোন সময় তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। এটাই ছিল তাঁর–রীতি নীতি। আবার কখনো মুরীদকে বলে দিতেন যে, তুমি অযু খানায় থাক। আর মুরীদও তার সে হুকুম মান্য করে চলত ।

হযরত শায়খ শামছুদ্দীন হানাফী (রহঃ) (মৃত–৮৪৭ হিঃ) এর বাণীঃ

দরবেশদের মনে কষ্ট দেওয়ার পরিণিতি

তিনি বলতেন যে, দরবেশদের নিকট লাঠি নেই যে, তাঁদের সাথে বেআদবী করলে পর তাঁরা উহা দ্বারা মারধোর করবেন ? বরং তাঁদের পক্ষ

থেকে শাস্তির ব্যবস্থা হল এই যে, যখন তাঁদের সাথে বেআদবী করা হয়, তখন তাঁদের অন্তর বিষণ্ন ও বিরক্ত হয়ে যেত। যা বেআদবের জন্য ইহলৌকি ও পারলৌকিক ধ্বংশের কারণ হয়ে থাকে।

হযরত শায়খ মাদাইয়ান ইবনে আহমদ আশ্‌মোনী (রহঃ)-এর বাণী ঃ

তিনি প্রথমিক শিক্ষ-দীক্ষা ও বাতেনী তারয়্যিাত হযরত সাইয়্যেদী আহ্‌মদ জাহিদ (রহঃ) এ নিকট লাভ করেন এবং শেষ শিক্ষা-দীক্ষা সমাপন করেন শায়খ মুহাম্মদ হানাফী (রহঃ) - এ নিকট ।

(উক্ত বুজুর্গদ্বয়ের আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে।)

কোন কোন সূক্ষ্ম ব্যাপারে বহিষ্কারের শাস্তি

তাঁর আদব ছিল যে, যখন মুরীদকে দেখতে পেতেন যে, সে যিকিরের হালকায় উপস্থিত হয় না, তখন তিনি তাকে বহিষ্কার করে দিতেন।

সুতরাং কোন একদিন জনৈক দরবেশের নিকট জিজ্ঞেস করলেন যে, হে প্রিয় বৎস! তুমি যিকিরের হালকায় উপস্থিত হওনা কেন। উত্তরে সে বলল যে, উপস্থিত তো এমন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন যে অলস এবং অলসতার দূর করার লক্ষ্যেও হালকায় উপস্থিত হবে ? আলহামদুলিল্লাহ্ আমি অলস নই। এ উত্তর শ্রবণে শায়খ তাকে বের করে দিলেন এবং বলেন এ ধরনের লোকতো সকল লোকদিগকে ধ্বংস করে দেবে। কেননা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, আমি অলস নই, যার ফলশ্রুতিতে খানকাহ্ নষ্ট হয়ে যাবে।

তারই আরেকটি ঘটনা

জনৈক দরবেশ একদিন খানকা থেকে বেরিয়ে এসে এক ব্যক্তির হাতে একটি শরাবেব্ পাত্র দেখতে পেয়ে সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। এ ঘটনা যখন শায়খের কর্ণগোচর হল, তখন শায়খ তাকে খানাকা থেকে বের করে দিলেন এবং বললেন যে, আমি তাকে খানকা থেকে এজন্য বের করিনি যে, সে একটি গর্হিত কাজের প্রতিবাদ করেছে। বরং আমি তাকে এজন্য বের করেছি যে, সে কেন তার দৃষ্টিকে এত মুক্ত -স্বাধীন ছেড়ে রেখেছে যে, সে গুনাহের কাজ দেখতে পেয়েছে।" কেননা দরবেশের কর্তব্য তো হল তার দৃষ্টিকে এত সংযত রাখা যে, তা কখনো পায়ের পাতা থেকে অতিক্রম না করে।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, সম্ভবতঃ শায়খ তাকে দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু সে ঐ নির্দেশ অমান্য করেছে বিধায় তাকে সতর্ক করেছেন। এ ব্যাখ্যা দ্বারা এ প্রশ্নের নিরসন হয়ে যায় যে, অনিচ্ছাকৃত কোন গুনাহের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়া তো নিজের ইখতিয়ার ভুক্ত নয়। আর তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ বলেও বিবেচিত নয়। তাহলে শায়খ কি করে তাকে বহিষ্কার করে দিলেন।

বিঃ দ্রঃ সাধারণত ঃ আমাদের যুগে যখন দ্বীনের সার্বিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে সুলূকের ক্ষেত্রে বুজর্গানে দ্বীনের রীতি-নীতিকে মানুষ একেবারে ভুলে গিয়েছে। তখন যদি কোন খোদার বান্দা ঐ পদ্ধতিত অনুযায়ী আমল করে, তখন তারা উহাকে একটা নতুন কিছু মনে করে। আর অজ্ঞ ব্যক্তিরা তো তার সমালোচনাই শুরু করে দেয়। আলহামদু লিল্লাহ্ থানাবান খানকায়ে এমদাদীয়া এখনো হযরত থানবী (রহঃ) - এর নেক নিয়্যতের বদৌলতে সে সব বুযুর্গানে দ্বীনের রীতিনীতি অব্যাহত রয়েছে। যা দেখলে পরে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মুখে একথা চলে আসে।

نہوزان ابررحمت درفشان ست

خم وخم خانہ بامہر ونشان ست

কবিতার অর্থ ঃ আজও রহমতের সে বারিধারা
রয়েছে সম্পূর্ণ অম্লান,
শরাব ও শরাবখানায় অক্ষুণ্ন আছে
মহব্বত ও স্মৃতির সে জাগরণ ।

হযরত শায়খ আলী ইবনে শিহাব (রহঃ)-এর বাণীঃ (মৃত-৮৯১হিঃ) খোদার ভয় ও আশা এবং নফসের হিসাব নেয়া অধিক এবাদত অপেক্ষা উত্তম ঃ

তিনি বলতেন যে, মানুষের বেশী বেশী ইবাদত করা আমার নিকট প্রিয় নয়। বরং আমার নিকট প্রিয় হলো যে, মানুষের আল্লাহকে বেশী ভয় করা ও আপন নফসের মুহাসাবা বা হিসাব নিকাশ করা।

ইমাম শা'রানী (রহঃ) তাবাকতে কোবরা নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হিজরী নবম শতাব্দীর যেসব মহান মনীষীদের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, তা এখানে সমাপ্ত হল। কিন্তু আমি অনেক লোকের আলোচনা ছেড়ে দিয়েছি। কারণ আমি এ কিতাবখানি শুধুমাত্র তরীকত পন্থীদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য রচনা করেছি। তাই সেসব বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনাই এখানে করেছি, যাদের আলোচনা করা কর্তব্য মনে করেছি এবং যাদের আলোচনা দ্বারা মুরীদদের আমলের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে এটাই হল মাশায়েখদের অনুকরণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্য। নেক আমল ও কারামতের ফলাফল কি হবে না হবে, সে দিকে চিন্তা গবেষণা করার স্থান এ দুনিয়া নয়; তার স্থান হলো পরকালে।

বিঃ দ্রঃ কেননা, এ দুনিয়ার ভিত্তি হল আমলের উপর, ফলাফলের উপর নয় । আর ফলাফল ও পুরুস্কারের স্থান হল আখেরাত। অতঃপর ইমাম শা'রানি (রহঃ) সে সব বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনা করেছেন, যাদের সাথে হিজরী দশম শতাব্দীতে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে দু-এক জনের ব্যতীত অধিকাংশের বাণীই তাসাওউফের কিতাবে উল্লেখ করা হয়নি। স্থান কাল পাত্র হিসেবে কখনো আমরাও তাদের দু-একটি বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি। আর যেহেতু তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাজযুব হালতের ছিলেন যাদেরকে অনুকরণ করা চলে না, এ জন্য আমিও (অর্থাৎ হযরত থানবী (রহঃ) যিনি হযরত শা'রানী (রহঃ)-এর অন্যতম শায়খ ছিলেন। কেননা শা'রানী (রহঃ) তরীকতের মধ্যে তাঁর স্মরণীয় বরণীয় বাণীগুলোকে একটি পুস্তিকায় সংরক্ষিত করে ছিলেন। তাই আমিও সে সব অবিস্মরণীয় বাণীগুলো নকল করেছি এবং অতিরিক্ত ফায়দার জন্য আলোচ্য বিষয়ের সাথে সমাঞ্জস্য থাকার কারণে উক্ত বুজুর্গের আরো কতগুলো বাণী ইমাম শা'রানী (রহঃ)- এ দু'টি পৃথক পুস্তিকা থেকে নকল করে ঐগুলোর সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছি।

পুস্তিকাদ্বয়ের মধ্য হতে একটির নাম "আল-গাওয়ায" ও অপরটির নাম "কিতাবুল জওয়াহির ওয়াদদুরার "।

যা হোক আমি আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য (অর্থাৎ উল্লেখিত মাশায়েখ ও আলী খাওয়ায (রহঃ)-এর হালত ও অবিস্মরণীয় বাণীগুলোর বর্ণনা শুরু করছি। সকল হিতাহিত ও অনুগ্রহের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ই।

ইহা তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত

প্রথম অধ্যায় ঃ দশম হিজরী শতাব্দীর মাশায়েখদের বাণী ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ) -এর বাণী, যে গুলো 'তবকাতে কোবরা' নামক গ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আলী খাওয়ায (রহঃ)-এর সে সব বাণী, যে গুলো উল্লেখিত কিতাবদ্বয় থেকে নকল করা হয়েছে।

উল্লেখিত বুযুর্গের বণীগুলোর বৃহত্তম একটা অংশ যখন সংকলন করা হয়েছে, তখন আমি তার একটা পৃথক নাম " মাকালাতুল খাওয়ায ফি মাকামাতিল ইখলাস " নির্বাচন করেছি।

আল্লাহ্র রহমত ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে আমি আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকে পদার্পণ করছিঃ

প্রথম অধ্যায়

দশম হিজরীশতাব্দীর মাশায়েখদের অবিস্মরণীয় বাণীগুলো থেকে হযরত মুহাম্মদ মাগরেবী শাযেলী (রহঃ) -এর বাণী ঃ

(তিনি ৯১০ হিঃ সনের পরে ইন্তেকাল করেন)

নবী করীম (সঃ) -কে জাগ্রত অবস্থায় দেখার হাকীকত

তিনি এরশাদ করেন যে,নবী করীম (সঃ)- কে জাগ্রত অবস্থায় দেখার অর্থ হল, কলব জাগ্রত হওয়া। শরীর জাগ্রত হওয়া মুরাদ নয়। এ কথার স্বপক্ষে দলীল পেশ করে বলেন যে, এটাই সুস্পষ্ট সত্য।

মাকলাতুল খাওয়ায ফী মাকামাতিল ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যিনি প্রশাংসারযোগ্য তার মহিমা ঘোষণা করছি। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা) যা কখনো নিঃশেষ হবার নয়। আর যিনি দুরূদ ও সালামের যোগ্য [অর্থাৎ হুজুর (সঃ)] তার প্রতি সালাম প্রেরণ করছি, যা কখনো বন্ধ হওয়ার নয় ।

হামদ ও সালাতের পর, নিবেদন এই যে, হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ)-এ অসংখ্য বাণীর মধ্য হতে এ একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা মাত্র। এর মধ্যে শুধু মাত্র সে সব বাণীকে সংকলন করা হয়েছে যে গুলো সর্ব সাধারণের বোধগম্য।

আর এগুলো তিন ভাগে বিভক্ত

প্রথম ভাগ ঃ ঐ সকল বাণী, যেগুলো 'তাবকাতে কোবরা' শারানী থেকে নেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ঐ সকল বাণী, যেগুলো 'দাওরে আওয়াস" পুস্তিকা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ ঃ ঐ সকল বাণী, দুই যেগুলো 'আল – জাওয়াহির ওয়াদ দুরার' নামক পুস্তিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে।

কোন জায়গায় আমি ইবারত বা আলোচনা সংক্ষেপ করে দিয়েছি, আবার কোন জায়গায় ব্রেকেট-এর মাঝে কিছু ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণও করেছি।

সর্বক্ষেত্রেই আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা দরকার, তিনিই সকল অনুগ্রহ ও দয়ার মালিক ।

সাক্ষাতের আদব

হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ) বলতেন যে, সাক্ষাৎকারীর জন্য নিয়ম হ'ল যে, সে যার সক্ষাতে যাবে তিনি যেন তার এ সাক্ষাতের কারণে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল না হয়ে যান। চাই সে ব্যক্তি এমনই হোক না কেন যে, কোন কিছুই তাকে গাফেল করতে পারে না। অথবা এমন সময়ে তার সাক্ষাতে যাবে যখন তিনি অবসর থাকেন।

ইমান শা'রানী (রহঃ) বলেন যে, এর উপর উহাকেও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, এমন সময়ও সাক্ষাৎ করতে নেই যে সময় সাক্ষাতের দ্বারা তার ব্যবসা তিজারতের ক্ষতি হয় ।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, আমি বলতে চাই এমন সময়ও সাক্ষাৎ করতে যাবে না যখন এলমী খিদমতের ক্ষতি হয়। যদ্দারা তিনি মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করেন।

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, সাক্ষাৎকারীদের নিয়ম নীতির মধ্য থেকে এটাও একটা নিয়ম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎকারী নিজের প্রতি এ ব্যাপারে আস্থাশীল না হতে পারবে যে, সে যার সাক্ষাতে যাবে তার মধ্যে যদি কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি দেখে তবে সে ঐগুলোকে গোপন করতে সক্ষম হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত সে সাক্ষাৎ করতে যাবে না। কেননা সে সময় সাক্ষাৎ না করাই উত্তম ।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, মানুষের দ্বীনি ক্ষতি করে, এমন দোষ-ত্রুটি আলোচনার অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এ ধরণের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া ওয়াজিব ।

হাদিয়ার আনুষঙ্গিক কিছু সুক্ষ্ম আদব

তিনি বলেন যে কাউকে প্রথমে গিয়েই হাদিয়া প্রদান করবে না, কিন্তু দুই অবস্থায় প্রদান করতে পারবে। (এক) হয়ত সে ব্যক্তি গরীব ও অভাবী (দুই) বা সে ব্যক্তি হাদিয়ার বিনিময় দিতে সংকোচ করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি এমন লোককে গিয়েই হাদিয়া প্রদান করে যে, তার অভ্যাস হলো তার সামর্থ থাকুক আর নাই থাকুক সে হাদিয়া বদলা বা বিনিময় দিতে চেষ্টা করে, তবে সে ঐ ব্যক্তিকে হাদিয়া প্রদান করে, তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিল।

'আল জাওয়াহির ' নামক গ্রন্থে আরো একটু সংযক্ত করা হয়েছে যে, আমি হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, যদি সে ব্যক্তি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে বিনিময় প্রদান করে, তবে তার হুকুম কিন্তু ? উত্তরে তিনি বললেন যে,তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে ব্যক্তি গরীব ও অভাবগ্রস্ত হয় এবং দু'য়ার দ্বারা হাদিয়া বিনিময় প্রদান করে তবে ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ এমন লোককে হাদিয়া প্রদান করা চাই। কেননা তার জিম্মাদার হলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি তারপক্ষ থেকে পুরা করে দেন।

তাওহীদের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া

তিনি বলতেন যে, যখন কোন বান্দার তাওহীদ পূর্ণতা লাভ করে, তখন তার জন্য মোটেই কোন অবকাশ থাকে না যে, সে মাখলুকের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তিরও নেতা বা সরদার হবে। কেননা ? সে তো কেবল মাত্র

আল্লাহরই অস্তিত্ব দেখে (আর কারো অস্তিত্ব দেখে না।)। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আম্বিয়া ঃ (আঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের ন্যায় যারা ছিলেন, তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বাহ্যিক নেতৃত্বও কর্তৃত্ব ছিল। পক্ষান্তরে তা কেবলমাত্র এন্তেজাম বা সুশৃংখলা ও পরিচালনা ছিল।(সুতরাং এর দ্বারা বিভ্রান্তিতে না পড়া চাই) আর তাও ছিল আল্লাহ্ তা'লার আদেশ ক্রমে এবং ইহা ছিল তাওহীদের পরিপূরক।

অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা

তিনি বলতেন মানুষের নৈতিকতার চরম পরকাষ্ঠা হল, দুশমনের সাথে এমন ভাবে ইহছান বা উপকার করা যে, সে টেরও করতে পারে না এবং সে অনুগ্রহের কাথা প্রকাশও না করে এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যও না করে।

কোন হালতের পতন হওযার দ্বারা অস্থির ও মনক্ষুণ্ণ না হওয়া

তিনি বলতেন যে, ব্যক্তির ইল্ম পরিপক্ক ও মজবুত, তার লক্ষণ হল যখন তার পতন ঘটে, তখন সে বিচলিত অধীর হয় না বরং তার মনোবল এবং দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পায়। কেননা অল্লাহ তা'আলা যে সব হালতের উপর সন্তুষ্ট সে সব হালতের সে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সঙ্গ লাভে ধন্য। নিজের নফসের খাহেশাত ও কামনা-বাসানার সঙ্গ লাভে ধন্য নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের কোন হালতের উপর তৃপ্তি অনুভব করে, সে এ হালতের পতন হয়ে যাওয়া বা ঐ হালতের মজুদ থাকা উভয় অবস্থাতেই নফসের প্রতি আনুগত্য করে।

নিজের হালতের প্রতি, শায়খের তাওয়াজ্জুর অপেক্ষা করে আমল না করার পরিণতি

তিনি বলতেন যে, দরবেশ ততক্ষণ পর্যন্ত কামিল হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের শায়খের নিকট থেকে যাবতীয় কষ্ট ক্লেশ বহন না করে । কেননা, যে ব্যক্তি নিজের বোঝা নিজের শায়খের উপর ন্যাস্ত করে সে বেআদব। এ ছাড়াও যখন সে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন সে যে কোন কষ্টের সময় থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে চাইবে। ফলে তার যোগ্যতা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সুতরাং যে কোন মুহূর্তে তার কোন আঘাত পৌছে তখন তার ধৈর্যের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে এবং শায়খ তাকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশংসাকারীর দিকে আকৃষ্ট না হওয়া

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন ঃ একবার আমি হযরত আলী খাওযায় (রহঃ)- কে জিজ্ঞেস করলাম যে, যে ব্যক্তি আমার প্রশংসা করে, নেকফালী বা শুভ লক্ষণ হিসেবে আমি কি তার প্রতি মনোযোগী ও আকৃষ্ট হব না ? কেননা মাদাহ্ বা প্রশংসা তো আল্লাহ তা'আলার একটি শিরোনাম। উত্তরে তিনি বললেনঃ না, যে ব্যক্তি তোমার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। কেননা যদি তুমি এরূপ কর তবে তোমার নফস প্রশংসা শুনায় আসক্ত হয়ে যাবে , অথচ তোমার কোন খবরও থাকবে না।

আর প্রত্যেক ঐ জিনিস যার প্রতি তোমার নফস আসক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে যাবে, তা তোমাকে চরমোৎকর্ষ সাধনকারীদের স্তর থেকে নামিয়ে দিবে। আর তুমি ইবাদত বন্দেগীর ঐসব আদব ও নিয়ম নীতি থেকে পেছনে থেকে যাবে, সে গুলোর শান হলো সর্বক্ষেত্রে তুমিই মোহ্তাজ আর আল্লাহ সর্বাবস্থায় অমুখাপেক্ষী হওয়া সব্যস্ত করা।

দুর্নামের স্থানে গমন করা ক্ষতিকর

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি একবার হযরত খাওয়ায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম দুর্নামের জায়গায় গমন করা কামিলীনদের জন্য কি ক্ষতিকর ? মুরীদীন ও অনুসারীদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত থানবী বলেন, কোন কোন বুযুর্গের মতে, ইহা ঔষধ হিসাবে বিষ খাওয়ার তুল্য। কদাচিত যারা এরূপ করে ছিলেন তাদের কোন মুরীদ বা অনুসারী কেউ ছিল না।

অলৌকিকতার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ক্ষতিকর

তিনি বলেন, আমি একবার হযরত খাওয়াযের নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, খলকেআদত অলৌকিকতার প্রতি মনোযোগী হওয়া কেমন ?

তিনি বললেন যে, নিয়ামতের প্রতি বান্দার মনোযোগী হওয়া, আর নেয়ামত প্রদানকারীর (আল্লাহ্ তা'আলা) প্রতি মনোযোগী না হওয়া চরম বেআদবী। তোমরা তো বড় জিনিসের বিনিময়ে ক্ষুদ্র জিনিস গ্রহণ করতে চাও।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, খলকেআদত বা অলৌকিকতাও নিয়ামতের মধ্যে শামিল। এ জন্যই সেগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়ার অর্থ উচ্চ স্তরের বস্তুকে বর্জন করে নিম্নস্তরের বস্তু গ্রহণ করার শামিল।

সফর সামগ্রী না নিয়ে হজ্জে গমণ ক্ষতিকর।

তিনি বললেন যে, একদা আমি শায়খের নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন কোন লোক প্রতি বছর সফর সামগ্রী না নিয়েই হজ্বে গমন করেন, ইহা কি প্রশংসনীয়?

তিনি উত্তর দিলেন যে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ফরজ, নফল উভয় প্রকার হজ্জের পূর্বশর্ত নির্দ্ধারণ করেছেন যাতে করে সে অন্যান্য মানুষের নিকট সাহয্যের মুখাপেক্ষী না হয় এবং যে তাকে খানা না খাওয়াবে বা তাকে যানবাহনের উপর অরোহণ না করাবে, সে যেন, তার ক্রোধের পাত্র না হয়। আর আগের বুযুর্গানে দ্বীন থেকে এ ধরণের সফরের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর উপর বর্তমানকে ধারণা করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা অত্যধিক সাধন করে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত থাকার অভ্যাস করে নিয়ে ছিলেন। এমনকি তাদের কেউ কেউ চল্লিশ দিন বা ততোধিক দিন পর্যন্ত পানাহার না করে থাকতে পারতেন। সুতরাং তাদের হালকে তাদের জন্য সঠিক রেখে দেয়াই বাঞ্ছনীয়, আর যারা নিজের সাথে সফর সামগ্রী নেবে না এবং তাদেরকে সাহায্য না করার দরুন মানুষকেও তীব্র ভাষায় গালি দেবে, তাদের জন্য এ ধরণের সফর করা হারাম।

নিজের মন্দ হালত শায়েখের নিকট গোপন না করা

আমি একবার তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, এমন সব কামনা বাসনা ও খারাপ জল্পনা-কল্পনা যেগুলোকে মুখে প্রকাশ করা সমাজে লজ্জাকর মনে করে, সে গুলোকে কি মুরীদ শায়খের নিকট অকুতোভয়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিবে? না শায়খের কাশ্‌ফের উপর ভরসা করে অন্তর দ্বারা প্রকাশ করাই যথেষ্ট। তিনি বললেন, শায়খের নিকট স্পষ্ট

ভাষায় বলে দেওয়া উত্তম, বরং অপরিহার্য। কেননা, মুরীদ ও শায়খের মাঝখানে কোন প্রকার অন্তরাল বা পর্দা নেই। কারণ শায়খ হলেন মুরীদদের জন্য ডাক্তার স্বরূপ। শায়খ মুরীদের অবস্থা কাশফ দ্বারা উপলব্দি করবে, এ ধরণের কষ্ট তাকে না দেওয়াই উচিত। এ ধরনের রীতি নীতি অনুযায়ীই পুর্বেকার মাশায়েখগণ চলে ছিলেন, এমনকি যদি কোন মুরীদের কোন দোষ-ত্রুটি করো কাশফের মাধ্যম প্রকাশ হয়ে গেছে, তবে এ ধরণের কাশফকে তদানীন্ত যুগের মাশায়েখগণ শয়তানী কাশফ বলে অভিহিত করেছেন। যা থেকে তারা তওবাও ইস্তেগফার করে ছিলেন। আর হযরত খাওয়াচ (রহঃ) থেকে অপর এক জায়গায় বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ বান্দার সাথে আল্লাহ তা'লার অবকাশের ইহাও একটি নিদর্শন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সামনে অপরাপর লোকদের এমন এমন দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দেন। যেগুলো তার ঘরের ভিতরের পর্দার আড়ালে করে থাকে। পক্ষান্তরে এ ধরণের কাশ্‌ফে কাশ্‌ফে শয়তানী। যা থেকে তওবা করা উচিত। আর যে মুরীদ নিজের শায়খের নিকট কোন কিছু গোপন রাখে প্রকৃত পক্ষে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং নিজের শায়খের প্রতি খেয়ানতে লিপ্ত। হযরত থানবী (রহঃ) বলেনঃ এর অর্থ হলো এমন ধরণের দোষ-ত্রুটি যেগুলোর তদবীর নেহায়েত সুক্ষ্ম ও জটিল। যা নিজে নিজে সংশোধন করা অসম্ভব। কিন্তু ঐ ধরণের দোষ-ত্রুটি মুরাদ নয় যেগুলোর তদবীর একেবারেই সুস্পষ্ট।

ক্ষমতার সাহায্যে শত্রুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত খাওয়াচ (রহঃ) – কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আরিফ যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে তার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে জালিম ও নির্যাতনকারীর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয কি না। অথবা জালিম অত্যাচারীর নির্যাতন থেকে নিজের সঙ্গী –সাথীদের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে হিফাজত করা বৈধ কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ জায়েয; যদি এই জুলুম ও অত্যাচর একবারই হয়ে থাকে না কেন, কিন্তু এর মধ্যে আদবের মাত্রা কম। কেননা ভদ্রতা তো এই যে, অপরাধীকে প্রতক্ষ্যভাবে অবলোকন করার পরও যতক্ষণ পর্যন্ত না আদিষ্ট হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। সুতরাং এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা দলীল হিসেবে কোন ত্রুটিযুক্ত নয়। কেননা, শরীয়ত প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। প্রয়োজন বশতঃ ক্ষমতা প্রয়োগের

মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয। আবার অনেক লোক এমনও আছে যে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হয় না। সে সময় তার একাজ কোরআনের সে আয়াতের ব্যাপকতার মধ্যে গণ্য হবে যার অর্থ হলো এই, যারা নির্যাতিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের প্রতি ভৎসনা করার কোন অবকাশ নেই।

মাজযুবদের সাথে ব্যবহার

আওলিয়াদের সাথে আদব সম্পর্কিত আলোচনা করার পর তিনি বলেন, কিন্তু মযজুবকে সালম না দেয়াটই সালাম বা শান্তি। (কেননা তার থেকে পৃথক থাকাই হলো নিরাপদ।) আর মাযজুবের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করবে না। কেননা হয়ত সে তোমাকে দোয়ার পরিবর্তে বদদোয়া করবে এমন বহু নযীর দেখাও গিয়েছে। অথবা তোমার গোপন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেবে। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, অধিকাংশ লোকই এ ব্যাপারে অসতর্ক।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করাই উত্তম

তিনি বলেন যে, আমি শায়খকে একথা বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। এবং এর প্রতিবিনয় ও কাতরতা প্রকাশ কর, যদিও দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পার। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দদের মধ্য থেকে তাদেরকে পছন্দ করে, যারা বালামুসীবতের সময় এবং আল্লাহর ক্রোধের মোকাবেলায় নিজেদেরকে দুর্বলতা ও অসহয়তা প্রকাশ করে। কেননা, কোন ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তৎপ্রতি ধৈয্য ধারণে সক্ষম নয়। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, এর বিপরীত কোন কোন বুযুর্গ থেকে ঘটনা বর্ণিত আছে, তা কেবল মাত্র একট হাল কিন্তু মাকাম নয়। (১)

সুতরাং কোন কোন আহলে মাকামের উপর এক এক সময় এক এক হালত সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

টীকা ঃ (১) হাল বলা হয় ঐ অবস্থাকে অস্থায়ীভাবে ক্ষণিকের জন্য মানুষের মাঝে যা দেখা দেয়। আর মাকাম বলা হয় স্থায়ী গুণ বা স্থায়ী যোগ্যতাকে।

কামালিয়াতের জন্য কারামত অপরিহার্য নয়, বরং কারমত তলব করা না-কামালিয়্যাতেরই পরিচয়

তিনি বলতেন, আমি হযরত খাওয়াযের নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, মুরীদ যদি কারামত প্রকাশ পাওয়ার জন্য আকাংখিত হয় এবং চেষ্টা সাধনা করে, তবে তার এ কাজটি তার কামালিয়্যাতের জন্য অন্তরায় হবে কি ? আর কারামত প্রকাশ না পাওয়া কি এ কথার দলীল যে, সে তরীকত পন্থীদের অন্তর্ভূক্ত নয় ?

তিনি উত্তর দিলেন যে, কারামতে প্রত্যাশী হওয়া ও এর জন্য চেষ্টা সাধনা করা ইখলাস বা নিষ্ঠার পরিপন্থী, তদুপরি কারামত প্রকাশ না পাওয়া ও কোন দলীল নয় যে, তরীকতপন্থীদের মধ্যে তার কোন স্থান নেই। এ কথার সারমর্ম হলো যে, দুনিয়া ফলাফল প্রকাশ বা পুরুস্কার প্রাপ্তির স্থান নয়, বরং দুনিয়া হল আমর করার স্থান। এ জন্য মুরীরেদ কর্তব্য শুধু আমল করা। আর ফলাফল ও পুরুস্কার প্রাপ্তির স্থান হল পরকাল। অতঃপর তিনি এ আলোচনার দীর্ঘ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

নিয়্যাত বিশুদ্ধ হওয়া ইবাদতের পূর্বশর্ত

তিনি বলেন ঃ আমি হযরত খাওয়ায (রহঃ) –কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যিকিরকারী শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগীর উদ্দেশ্যেই যিকির করবে, কোন মাকাম বা মর্যাদা হাসিলের নিয়্যাতে নয়।

ওযর ব্যতীত এক নিয়্যাত বর্জন করে অপর ইবাদতের নিয়্যাত কর মাকরুহ

তিনি বলেন, আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যে, শয়তান কোন সময় মানুষকে এক আমল থেকে ফিরিয়ে অপর আমলের দিকে মনোনিবেশ করানোকেই যথেষ্ট মনে করে। যেমন সে প্রথমে মানুষের অন্তরে একটি চিন্তা সৃষ্টি করে দেয় যে, সে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গিকার করে আমি আগামী অমুক তারিখে রাত্র জেগে নামায পড়ব। অতঃপর যখন সে নির্ধারিত রাত্র চলে আসে, আর সে ব্যক্তি তখন নামায পড়া আরম্ভ করে এমন সময় শয়তান উপস্থিত হয়ে তাকে প্ররোচিত করে যে, নামায পড়া থেকে যিকির করা উত্তম। কেননা যিকির দ্বারা একাগ্রতা হাসিল হয়। ফলে

সে লেক শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নামায ছেড়ে দিয়ে যিকিরে মশগুল হয়ে যায়। যার কারণে সে লোক আল্লাহ্‌র সাথে দেয় অঙ্গিকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শয়তানের উদ্দেশ্য এটাই ছিল।(আল্লাহ্‌র সাথে দেয়া অঙ্গিকার ভঙ্গ করানো।)

বিঃ দ্রঃ–আল্লাহর সাথে কোন ইবাদতের প্রতিশ্রুত সাধররণতঃ দুই প্রকারে হতে পারে একটি এই ভাবে যে, মুখের দ্বারা এ কথা বলে দেয়া যে, আমি? অমুক তারিখে রোযা রাখব। যেটাকে শরীয়তের পরিভাষায় নযর বা মান্নত বলে! আর এটা পূর্ণ করা ওয়াজিব। দ্বিতীয়টি এই ভাবে মুখের দ্বারা এ ধরণের বাক্য উচ্চারণ না করা। মনে মনে সংকল্প করা প্রকৃতপক্ষে যদিও এটা মান্নত বা নযর নয় যে, এটাকে পূয়ন করতে হবে, কিন্তু ইহাও নযরে মতই, এজন্য সূফী–সাধকগণ এ ধরণের ব্যাপার গুলোকেও পূর্ণ করতেন যেভাবে মান্নত পুরা করতেন। হাদীসের মধ্যে এ ব্যপারে দলীল মজুদ আছে যে, কোন আমল প্রকৃতক্ষে ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু যখন কোন লোক সে আমলে অভ্যাস করার পর উহাকে ছেড়ে দেয় তখন রাসূলুল্লা (সঃ) একে অস্বীকার করেন। পরে তিনি ছেড়ে দিলেন হুজুর (সঃ) ব্যপারটা জানার পর উক্ত সাহাবীকে সতর্ক করে দিলেন।

আল্লাহ্‌ও বান্দা উভয়ের প্রতি এক সাথে মনোনিবেশ করা যায় না

তিনি বলেন ঃ আমি একবার হযরত খাওয়ায (রহঃ)–এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, যিকির কারীর পক্ষে এটা কি সম্ভব যে, সে মানুষের দিকে মনোনিবেশ করবে এবং তাদের সাথে আলাপ –আলোচনাও করতে থাকবে। সাথে সাথে আলমে বাতেন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে এমনভাবে মনোনিবেশ করবে যেমন সে নির্জনতার সময় করে থাকে।

উত্তরে তিনি বলেনে যে, এরূপ হতে পারে না। তেমারা কি শুননি যে,নবী করিম (সঃ) সাইয়্যেদুল মুরসালীন হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁর নিকট ওহী আসত তখন তিনি উপস্থিত সকলের থেকে সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে ওহীর প্রতি মনোনিবেশ করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওহী বন্ধ হত। আর এও ছিল সে সময় যখন তিনি একজন ফেরেশতার সাথে আলোচনা করতেন। এ থেকে তোমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পার যে, যখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আলাপ করতেন। তখন কি ধরণের মনোযোগ দিতেন।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন যে, অনেক লোকই এ ধরণের ধোঁকায় পড়ে রয়েছে যে, তসবীর দানা ঘুরাচ্ছে আর মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা করছে।

সালিক ও মাজ্জুবের তরীকিত ও মাফোতের ব্যবধান

তিনি বলেন ঃ আমি হযরত খাওয়ায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, মাজযুবও সালিকের ন্যায় তরীকতের প্রজ্ঞা রাখে কি ? তিনি বলেন যে, মাজযুবের জন্য ঐ সকল মাকামগুলো অতিক্রম করা অপরিহার্য, যেগুলো তরীকতের নিদর্শন ! কিন্তু মাজযুব সেগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে যায়।

পক্ষান্তরে সালিক তার বিপরীত। কেননা, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হিকমত ও ইচ্ছা অনুপাতে প্রত্যেক মাকামে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখেন।

এজন্য তোমরা এমন মনে করবে না যে, মাজযুব তরীকত জানে না। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন ঃ এ পার্থক্য থেকে আর একটা পার্থক্যও এই রের হয় যে, সালিক নিজের ইখতিয়ার ও ইচ্ছা শক্তির দ্বারা মুরীদের তারবিয়্যাত করতে সক্ষম। কিন্তু মাজযুব তার উল্টো। কেননা, সে কারো বিশেষ অনুমতি ব্যতীত মুরীদের তারবিয়্যত করতে পারে না। এজন্য পারে না যে,তারবিয়্যাতের শান বা অবস্থা হল, যখন মুরীদ কোন মাকামে অবস্থান করে, তখন সেও তথায় অবস্থান করবে। আর এটা মাজযুবের জন্য অসম্ভব। সুতরাং আরিফ হল "আবুল ওয়াক্ত, (অর্থাৎ সে নিজের হালের উপর গালিব।) আর মাজযুব হল "ইবনুল ওয়াক্ত" অর্থাৎ আপন হালের উপর মগলুব।

সংক্ষিপ্তা কারে তরীকাতে তালিম দেওয়া শ্রেয়

তিনি বলেন ঃ আমি হযরত খাওয়াযকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মুরীদের জন্য তরীকতের মঞ্জিলদ্ধগুলো সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করাই কি মাশায়েখদের জন্য উত্তম না কি মুরীদকে তরীকতে ময়দানে উম্মুক্ত ছেড়ে দিবে যে, সে তরীকতের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াবে ?

তিনি বলেন যে, না সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করাই শ্রেয়। শাইখ আবু মাদাইন (রহঃ) –এর রীতিও এরূপ ছিল যে, তিনি মুরীদের জন্য সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির চিন্তা–ভাবনা করতেন এবং তাকে অল্প সময়েই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দিতেন। কিন্তু আলমে মালাকুতে গমণ করতে দিতেন না।(আলমে মালকুতের অর্থ হলো উর্দ্ধজগৎ অর্থাৎ আলেম আরওয়াহ্,

বেহেশত, আলমে তাকবিনিয়া ইত্যাদি।) এই ভয়ে যে, নফস আলমে মালাকুতে বিভিন্ন প্রকার আশ্চর্যপূর্ণ ও তাৎর্যপূর্ণ বিষয়াদি দেখে শুনে তৎপ্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। অতঃপর তিনি বললেন তোমরা কি হযরত আবু ইয়াজীদ বোস্তমী (রহঃ) এর কথা শুননি ? অনেক লম্বা ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি বললেন – আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আমার মালিক, আমি আপনার নিকটবর্তী কিভাবে হতে পারব ? তিনি বললেন, নিজরে নফস্কে ছেড়ে দাও এবং চলে আস। সুতরাং আমার জ্যন্য আল্লাহ্ তা'আলা তরীকতে এক অতি সূক্ষ্ম ও সংক্ষিপ্ত বাণী দ্বারা সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন। কেননা, মুরীদ যখন তার কামনা বাসনা ও নফসের গোলামী ছেড়ে দেয়, তখন তার আল্লাহর সঙ্গ হাসিল হয়ে যায়। আর এটাই সবচেয়ে সংক্ষেপ পথ। হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমাদের শাইখ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) –এর মাসলাকও অনুরূপই ছিল।

আর নফসের গোলামী ছেড়ে দেয়ার অর্থ হলো ফানা হয়ে যাওয়া। আর এই ফানাই ছিল আমাদের শায়খের তরীকা – আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের শায়খ এই পদ্ধতির উপকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর অনেক দীর্ঘ আলোচনা করতেন এবং আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা সমূহ বর্ণনা করতেন।

হযরত মুফতি মোহাম্মদ শফী (রহঃ) বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের শাইখ হযরাতুল আল্লাম হেকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর সেখানেও সালফে সালেহীনেরই হুবুহু রীতি-নীতি ছিল। আর এ বিষয়টিকে তিনি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুধার্ত থাকার সীমারেখা

তিনি বলেনঃ আমি হযরত খাওয়ায (রহঃ) – কে জিজ্ঞেস করলাম যে,সওমে বেসালে (অর্থাৎ অনবরত রোযা রাখা , দিবা –রাত্রি কিছুই পানাহার না করা) জায়েয আছে কি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ জায়েয তবে এমন ব্যক্তির জন্য যে, ঐ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, যখন সে রাতে শুইত যায় তখন আল্লাহার পক্ষ থেকে তাকে পানাহা করানো হয় (অর্থাৎ যার ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা রহিত করা হয়েছে। হুজুর (সঃ)–এর উত্তরাধিকার সূত্রে। কেননা, হুজুর (সঃ)–এর হালতে তাইয়্যেবার মধ্যে এরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং এহেন ব্যক্তিত জন্য সওমে বেসাল জায়েয। কিন্তু এখানেও আরেকটি শর্ত আছে তাহা এই যে, সে ব্যক্তি ক্ষুধাজনিত কারণে নিজের মস্তিক শক্তিতে শারীরিকভাবে কোন প্রকার দূর্বলাতা অনুভাব করতে পারবে না আর যদি সে দূর্বলতা অনুভব করে তবে তার জন্য "সওমে বেসাল" জায়েয হবে না। এটা এ জন্যই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইহলৌকক ও পারলৌকিক কল্যাণ সম্পর্কে সর্বিশেষ অবহিত। তিনি রোজদার জন্য সোবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ এজন্য করেছেন যে,তিনি জানেন এ চেয়ে অতিরিক্ত করলে শারীরিক ভাবে মানুষ দুর্বল হয়ে পড়বে। যার কারণে অনন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জামদিতে সক্ষম হবে না। আর যারা, কোন শায়খের অনুকরণ অনুসরন ব্যতীত অত্যধিক ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় তারাই এ ধরণের দুর্বলতর শিকার হয়।

অতঃপর আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম ঃ যদি "সওমে বেসাল" আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকার দরুন কোন রূহানী শক্তি মনে হয়, সে গুলো তাকে পানাহর থেকে বিরত রাখে, তবে ইহা কি জায়েয ?

উত্তরে তিনি বলেন, এমন ব্যক্তির হাল তার জন্যই রেখে দেয়া উচিত। অর্থাৎ এমন ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্ক আলোচনা না করাই উচিত। কেননা, কোন কোন দরবেশ এমনও আছে যে, সে যদি পানাহার করে তবে সে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বল হয়ে যায়। আর যদি ক্ষুধার্ত থাকে তবে পেট পূর্ণ থাকে ও স্বাস্থ্য সবল থাকে। যেমন–আমরা ইবনে

ইরাকের শিষ্যগণের মাঝে অনেককেই এরূপ দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেনঃ খাদ্য দ্রব্য সামনে উপস্থিত থাকা সত্বেও না খেয়ে ক্ষুধার্ত থাকা কোন বুদ্ধিমানের জন্য শোভনীয় কাজ নয়। কেননা এর দ্বারা সে নফসের হকের মধ্যে জুলুম করবে। তাই এটি নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ।

হুজুর (সঃ) ক্ষুধা সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ ক্ষুধা অত্যন্ত মন্দ সাথী (অর্থাৎ পীড়'দায়ক বস্তু)। অতএব, হুজুর যে, অনবরত ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটাতেন তার কারণ এই ছিল যে, খাওয়ার জন্য কোন খাদ্যই ঘরে থাকত না। অথবা কোন অভাবগ্রস্ত দীন-দুঃখীকে দান করে দিতেন। ফলে ঘরে কিছুই অবিশিষ্ট থাকত না। হাদীসে শরীফে এরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত থানবী (রহঃ) বলেনঃ আলহামদুলিল্লাহ, অনেক দিন আগে থেকেই আমার ধারণা এমন ছিল যে, হুজুর (সঃ)–এর ক্ষুধার্ত থাকাটা কোন ইখতিয়ারী বা ইচ্ছাকৃত ছিল না বরং ইজতেরারী বা অনিচ্ছাকৃত ছিল। যদিও অনেক লিখকের মতামত এই যে, হুজুর (সঃ) এর ক্ষুধার্ত থাকাটা ইচ্ছাকৃত ছিল। (১)

---

*(১) **টীকা ঃ** অনুবাদক মুফতী সফী সাহেব (রহঃ) বলেন, ইখতিয়ারী তথা ইচ্ছাকৃত বলা যদিও এ অর্থে ঠিক যে, নবী (সঃ) দোয়া করলে এবং চাইলে অভাব অনটন বিদূরিত হয়ে যেত। এমনটি –ই প্রতিভাত হয় জিব্‌রাঈল সম্পর্কিত হাদীস হতে। সে হাদীসে ওহোদ পাহাড়কে স্বর্ণকরে দেয়ারা কথা এসেছে। অথচ নবী (সঃ)–এর পক্ষ হতে অস্বীকৃত বর্ণিত আছে।*

***সারকথা এই যে,** ইখ্‌তিয়ার তথা ইচ্ছর দুটি স্তর আছে। খাবার কাছে আছে। আর শরিয়তের পক্ষ হতে কোন বাঁধা নিষেধও নাই– এমন যদি হয়, তাহলে ক্ষুধার্ত থাকা শোভনীয় এবং সুন্নত নয়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, কানায়াত এমন অবস্থায় করা যখন ক্ষুধার্ত থাকতে হয়, কখনো এমন অবস্থা দূর হওয়ার জন্য দোয়া কিংবা তদ্‌বীর না করা চাই এটি–ই সুন্নাত। এই স্তরটিতে যেহেতু ইখ্‌তিয়ার বা স্বীয় অধিকারে বিদ্যমান রয়েছে, এজন্য কোন কোন মণীষী এটিকে ফেক্‌রে ইখ্‌তিয়ার বা ঐচ্ছিক দৈন্যতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তা না হলে প্রথম শ্রেণীর দৈন্যতা এবং অনাহারকে গ্রহণ করা মুর্খতা বৈ কিছু নয়। এটি সুন্নত নয়।*

স্বনির্ভরতা এবং বিরাগী হওয়ার সীমারেখা

হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ) স্বহ্‌দ বা বিরাগী হওয়ার সম্পর্কে এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন প্রকৃত যাহিদ যারা, তারা দুনিয়ার প্রতি মহব্বত এবং আসক্তি নিয়ে দৃষ্টি দেয় না। বরং অপরিহার্য জাগতিক উপাদান যা ছাড়া কাজ চলে না ওগুলোর সুষ্ঠু সমাধান ও তাদবীরের মিমিত্ত দৃষ্টি দোয় দুনিয়ার দিকে–অতএব, যে ব্যক্তি এ দাবী করবে, আমি একমাত্র খোদারই কারণে দুনিয়ার হতে স্বাধীন মুখাপেক্ষিতা মুক্ত, সে জাহিল ও চরম মুর্খ। কেননা, একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে অবশিষ্ট সবকিছু হতে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়া প্রকৃত অর্থে কোন সৃষ্টির পক্ষে আল্লাহরই অনুপম বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং এ কথাই প্রতীয়মান হল, সূফীয়ায়ে কিরামের উদ্দেশ্য "দুনিয়ার প্রতি বিরাগ হওয়া" দ্বারা শুধু যে, অন্তর মুক্ত থাকা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়াকে হাসিল করার পেছনে ন্যাস্ত ও ব্যস্ত না হওয়া। পুনরায় আমি আবেদন করলাম, 'যুহ্‌দ' এর স্থানে একনিষ্ঠতার নিদর্শন কি ? উত্তর দিলেন, যুহদে একনিষ্ঠতার নিদর্শন হচ্ছে, বান্দা স্বীয় হাতে বর্তমান বস্তুটির চেয়ে আল্লাহ্‌ পাকের উপর ভরসা বেশী বেশী করা। তারপর আয়ত্তের বস্তুর উপর প্রজ্ঞামূলক হস্তক্ষেপ করা। তাতে অপব্যয় না করা এবং কার্পণ্যও না করা। কেননা, বান্দাহ স্বীয় অধিকৃত দ্রব্যে আল্লাহ পাকের পবিত্র দু'টি নাম মু'তী (দাতা) এবং মা'নী (বাধাপ্রদানকারী) উভয়টির ব্যাপারেই তার পক্ষ হতে প্রতিনিধি। এজন্য বান্দাহর জন্য সমীচীন হবে– প্রয়োজনে বিরত এবং প্রয়োজনে খরচ করা।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলার দু'টি গুণ রয়েছে। এ হিসেবে তিনি তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞার নিরিখে কাউকে দান করেন, আবার কারো থেকে তা বিরত রাখেন। অনুরূপ মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি যেহেতু, তাই তার সে প্রতিনিধির দায়িত্ব আদায় করা অপরিহার্য। অর্থাৎ, যেসব ক্ষেত্রে খরচ করা আল্লাহর কাছে নৈকট্যতার কারণ হবে সেখানে খরচ করা চাই । আর যেখানে খারচ করাটা নিষিদ্ধ সেখানে না করা চাই। মূল প্রণেতা হযরত থানবী (রহঃ) বলেন আলোচ্য বিষয়ে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটিই সর্বোত্তম বলে মনে হয়।

" নিজের ভাগ্যে গুনাহ্ লিপিবদ্ধ রয়েছে" মর্মে কারো অন্তরে কাশফ হয়ে গেলে সে ব্যক্তির হুকুম

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন , আমি আমার শায়খ আলী খাওয়াযের খিদমতে আরজ করেছি ,ঐ ব্যক্তির করণীয় কি হবে। আল্লাহ্ পাক যাকে ভবিষ্যতে কর্ম সম্পর্কে অবগতি দিয়েছেন এবং সে নিয়মিত অবগতি মুতাবিক বাস্তবে তা ঘটতে দেখছে। তার জন্য কি জায়েয হবে সে আগাম কর্মে অগ্রসর হয়ে শীঘ্রই তার থেকে পরিত্রাণ লাভ করা। তাহলে কু-কর্মের কু-আকৃতি দৃষ্টি হতে বিদূরীত হয়ে যাবে। নাকি তার সবর করা চাই ? হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ) বলেন, কোন বান্দাহর জন্য কু-কর্মে অগ্রসর হওয়া জায়েয হবে না। বরং তার সবর করাই উচিত।

যখন আল্লাহ্ পাক কোন বান্দাহার উপর কোন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার ইচ্ছা করেন,তখন তার বিবেক বুদ্ধি ছিনিয়ে নিয়ে যান। আর অন্তর সে ব্যাপারে পরিলুপ্ত হয়ে যায়। অতঃপর সে গুনায় ধাবিত হয়ে যায়। তারপর তাকে ইস্তেগ্ফারের হুকুম দেন। সুতরাং যে ভালো কাজ করে শোকর এবং মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে ইসতিগফার করা প্রয়াস পায়। সে মোটামুটি হক আদায় করেছে। যা তার জন্য প্রয়োজন ছিল। এটুকু করলে নবী (সঃ)-এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা নবী (সঃ)-এর অণুসরণ ও অনুকরণের জন্য গুনাহ মোটেই প্রকাশ না পাওয়া শর্ত নয়। বরং শর্ত এতটুকু গুনায় স্থায়ী না হওয়া। বরং গুনাহ করে ফেললে বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক তাওবা করে নেয়া। পুনরায় আমি আবেদন করলাম আল্লাহ্পাক কোন বন্দাহকে তার অদৃষ্ট কর্ম সম্বন্ধে জানিয়ে দিলে এবং তা বাস্তবায়িত হতে দেখা গেলে এর মধ্যে লিপ্ত হওযার দরুন তত্বটি কি ? তিনি বললেন, কারো যদি এমনই হয় তাহলে মনে করতে হবে সে শরীয়েতের পরিপন্থী কাজে তাক্দীরের লিখন হিসেবে লিপ্ত হয়। প্রবৃত্তির মোহে স্বভাবের তাড়নায় ও হারাম কাজে বেপরোয়া হওয়ার কারণে নয়। তারপর আমি আবার আরয করলাম, তার জন্য সে কু-কর্ম মুবাহ হয়ে যাওয়া সম্ভব কি ? হযরত আলী খাওয়ায (রহঃ) উত্তরে বললেন, না এমন কাজ কখনো তার জন্য জায়েয হতে পারে না। কেননা গুনাহ্র নামটি তো আর দূর হয়ে যায় না। এর কয়েক লাইন আগে তিনি লিখেছেন এ ভাষ্যটির স্বপেক্ষে ইঙ্গিত ঐ হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। যাতে আঁ হযরত

(সঃ) হযরত উমরকে বলেছেন, তোমার জানা আছে কি আল্লাহ্ পাক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের সম্পর্কে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন ? হে বদরীগণ! তোমরা যা চাও কর। তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কেননা, হদীসে বলা হয়েছে।, তোমাদেরকে গুনাহ্ মাফ করো দেয়া হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি তোমাদের জন্য গুনাহ্ জায়েয কর হয়েছে। অথচ ক্ষমা গুনাহ্রই পরে।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ বিষয়ে সঠিক সমাধান এটি–ই। অথচ কোন কোন মুরুব্বী থেকে বিষয়টিতে ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। যা স্বীয় শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) থেকে আমার শ্রবণ করার সুযোগ হয়েছে। এমনটি কতিপয় বাহ্যিক ইলমধারী ও এখানে দ্বন্দ্বে পতিত হয়েছে। যা একটু পরেই আমি 'মুসাল্লামুস" সবুত" –কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে পেশ করব।। ভ্রান্তি যেটি এদের থেকে পরিদৃষ্ট হয়েছে সেটিই অলোচ্য ও নির্ভরযোগ্য । আহ্লে বাতিন তথা আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণের প্রমাণাদি এ ব্যাপারে রুচিগত ব্যাপার। তাই তাঁদের ক্রটি মার্জনীয়। কিন্তু আহ্লে যাহির বা বাহ্যিক ইলমধারীগণকে স্পষ্ট হয়ে থাকে। অথচ বর্ণিত বিষয়টি স্বপক্ষে কোন প্রমাণই ইলমের মধ্যে বিদ্যমান নেই। এখানে আমি আহ্লে যাহির স্থুল ইলমধারীদের উক্তি 'মুসাল্লাসুম সবুত' হতে বর্ণনা করছি। যা তৃতীয় অধ্যায়ের 'সম্ভব্যকে করার নির্দেশ দেয়া সার্বিকভাবে অবান্তর" এ প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, তিনি বলেন, আশায়িরাগণ দ্বিতীয় প্রমাণটি দিতে গিয়ে বলেন। আবু জেহেলকে ঈমান আনায়নের নবী (সঃ) কর্তৃক সবকিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর। ওসব জিনিস হতে একটি এটিও যে, আবু জেহেল নবী (সঃ) –এ উপর বিশ্বাস ও ঈমান আনবে না। তাহলে আবু জেহেলকে যেন এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সে নবী (সঃ) –এর উপর যে ঈমান আনবে না এ বিশ্বাস না আনার উপর নির্ভরশীল। কেননা যদি নবী (সঃ) এর উপর ঈমান সে আনেই ,তাহলে এটি তার জানা থাকা স্বাভাবিক । তারপর তিনি বলেন যা (মুখতাসারের ব্যাখ্যায় উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে।) বলা হয়েছে। যদি সে জানতে পারে তাহলে সে তাকলীফ তথা আদিষ্ট হওয়ার দায়িত্ব বাতিল হয়ে যায়।

সুতরাং এ উত্তরটি যথাযথ নয়। কেননা মানুষকে কখনো বেকার ও নিষ্কর্ম হিসেবে ছাড়া হয়নি যে, তার আদিষ্ট হওয়ার গণ্ডির বাইরে চলে

যাবে। গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, উল্লেখিত আহলে যাহির বা স্থুল ইলমধারীদের উক্তি দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এটিই ছিল। দেখুন! এসব আলিমগণ এরেই প্রেক্ষিতে কিভাবে সেটিকে তার ভাগ্যে "কছুর" নির্দ্ধারণের যে নির্দেশ, তা থেকে খারিজ করার চেষ্টা করেছে ? এর বিবরণ ও বিশ্লেষণ মূল কিতাব ও তার টীকায় দ্রষ্টব্য। হযরত থানবী (রহঃ) আরো বলেন, এ মাস্‌য়ালটি খুবই সূক্ষ্ম। আল্লাহর ফায়সালা তাকদীরের তথ্য জানা ছাড়া এটি পুরোপুরি পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নয়। আর তা আশা করাও যায় না। এজন্য এর তাত্ত্বিকতার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে মনে প্রাণে মেনে নেয়াই বাঞ্ছনীয়। এতে চিন্তা গবেষণা এবং আলোচনা অবাঞ্ছিত।

বাতেনী মুকামের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমি স্বীয় শায়খ খাওয়ায (রহঃ) থেকে শুনেছি, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল–মুকাম হাসিলকারীগণের মুকাম কখন পর্যন্ত স্থায়ী ও অক্ষূণ্ন থাকে? উত্তরে তিনি বলনে, মুকাম বা স্তর বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কোনটি একাধিক শর্তের উপর নির্ভরশীল। শর্ত যখন দূরীভূতঃ হয়ে যায়, তখন সে মুকামও অপসারিত হয়ে যায়। যেমন তাকোয়া।

কেননা, এটি নিষিদ্ধাবলী এবং সন্দেহযুক্ত বিষয়াদির মাঝখানে বিদ্যমান একটি স্তর। যদি দুইটি পরিলুপ্ত হয়, তবে তাকোয়ার মুকামটি পরিলুপ্ত হয়। অনুরূপ মুকামে তাজরীদ ব আত্মশুন্যতার মুকাম। এ মুকামটি অর্জিত হয় উপকরণাদি পরিহর করার মাধ্যমে। উপকরণাদি না থাকলে মুকামও বর্তমান থাকে না। আবার কিছু মুকাম এমনও আছে যা ইনতিকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তারপর দূর হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ তওবা এবং শরীয়তের বিধি–বিধানগুলো। আবার কিছু এমন ও থাকে। যা জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যেমন আশাও ভীতি। কিছু আবার এমনও রয়েছে। যা জান্নাতে প্রবেশ করার পরও টিকে থাকবে। যেমন প্রীতি, সোহার্দ এবং সৌন্দর্য গুণের বিকাশ।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলে এসব ব্যাখ্যা হচ্ছে বিকাশ ও প্রকাশগত দিকের নিরিখে। কিন্তু ন্যায্যতঃ এবং প্রতিভা গতভাবে এসব মুকামাত সমভাবেই স্থায়ী থাকার কথা। অর্থাৎ প্রকাশের দিকে তাকালে কখনো মৃত্যু পর্যন্ত, কখনো জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত থাকে। যেমন ভীতি ও আশার মুকাম, কিন্তু এসব গুণাবলীর সাথে সে ব্যক্তিকে গুণী বলা মুকামের দৃষ্টিতে কোন তফাত নেই। যেমন জান্নাতে প্রবেশ করার পরও ঐ ব্যক্তিকে মুত্তাকী, খোদাভীতি সম্পন্ন, আশাবাদী ইত্যাদি বলা যাবে।

সুতরাং মুকামাতের মধ্যে আসল হল সব সময় অবিচল থাকা। হ্যাঁ যদি কোন বিঘ্নতা আসে তখন ভিন্ন কথা। যদ্দরুন সেটি দূরীভূত; হয়ে যাওয়ার কথা। হালাতের মধ্যে সে মুকামটি পরিলুপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। যদি কোন গ্রহণযোগ্য কারণ আসে তখন স্থায়ী থাকার কথা।

আতঙ্কের বয়ান ও হুকুম

আল্লামা শা'রাণী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কোন কোন প্রিয় বান্দার উপর তাঁর পক্ষ হতে আতঙ্কের প্রভাব হয়। ফলে সে একেবারেই অচল ও স্তব্ধ হয়ে যায়। দ্বীনি হোক, চাই জাগতিক হোক। কোন কাজেই তাঁর গতিশীলতা বজায় থাকে না। আমি শায়খের খিদমতে এক পর্যায়ে আরজ করলাম এখনও কি সে বান্দাহ্ আল্লাহর হুকুম পালন করার যোগ্য থাকে।তিনি জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ থাকে, সাধ্যনুযায়ী। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর সাধ্যপরিমাণে। নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন, যখন আমি তোমাদের কোন কাজ করার হুকুম করব তখন তো তোমরা তা পালন করার জন্য স্বীয় সাধ্যানুয়ায়ী আদায় করবে। অতঃপর আমি আরজ করলাম এ অবস্থায় যদি তাঁর থেকে কোন হুকুম বা ইবাদত ছুটে যায় ? স্বস্তি আসার পর তা পূরণ করা অপরিহার্য কি? তিনি জওয়াব দিলেন হ্যাঁ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সমীচীন হল আমলের কাযা করে নেয়া। কারণ শরীয়রেত হুকুম সর্বাবস্থায় জারী থাকে। শায়খ খাওয়ায (রহঃ) – এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু আর বলেননি।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে এ ব্যাপারে আর একটু কথা সংযোজন করেছি, এ ব্যক্তি কে এমন ব্যক্তির সাদৃশ ভাবা ঠিক হবে না, যার বেহুশ অবস্থায় একাধারে ছয় ওয়াক্ত নামায ছুটে গেছে।

তাওয়াযূ বা নম্রতার হাকীকত

আল্লামা শা'রানী বলেনঃ আমার শায়খ খাওয়াযের নিকট আমি নম্রতার হাকীকত সম্পর্কে জিজেস করলাম উত্তরে তিনি বললেন–তাওয়াযূর মূলকথা হচ্ছে, স্বীয় সহচরদের মধ্যে নিজেকে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করা। এ ক্ষুদ্র ভাবার বিষয়টি স্বভাব ও রুচিগতভাবে হওয়া চাই। শুধু ইলমী ভাবে হলেই চলবে না। আর এটি এজন্য যে, রুচি ও অন্তরাত্মা যাদের থাকে তাদের মাঝে-অহংকার বা অহমিকা থাকতে পারে না। তিরস্কারকারীদের

দ্বারা তার কিছু আসে যায় না। আর যদি এ তাওয়াযু ইলমের মাধ্যমে অর্জিতের স্থানেই সীমিত থাকে, তবে কখনো কখনো তার মধ্যে অহংকার প্রবিষ্ট হয়ে যায়। তিরস্কার ও হেয় প্রতিপন্নকারীদের দ্বারা সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাওয়াযুর দর্শনে একটি রহস্য আছে। বুঝে নেয়া একান্তই আবশ্যক। আমি আবেদন করলাম–রহস্য সেটি কি? তিনি জওয়াব দিলেন, তাওয়াযুর শর্ত হচ্ছে স্বীয় তাওয়াযুর প্রতি তার লক্ষ্য না হওয়া। কেননা যে ব্যক্তি তার তাওয়াযু প্রত্যক্ষ করছে, সে তো নিজের জন্য মর্যাদাপূর্ণ স্থান সাব্যস্ত করছে। তারপর আপন ভায়ের সামনে সে স্থানকে অন্তরে রেখে স্বীয় হীনতা ও নিকৃষ্টতা দেখাচ্ছে। বস্তুতঃ অহংকারে লিপ্ত হওযার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

তারপর আমি আবেদন করলাম কমিল বান্দাগণ আল্লাহর শোকর করার উদ্দেশ্যে নিজের কামাল তথা গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেন কেন? জওয়াবে তিনি বললেন আমাদের আলোচনা কামিলদের সম্পর্কে নয়, তাদেরকে তো দৃষ্টির পিতা (আবুল উয়ুন) আখ্যা দেয়া হয়। এক দৃষ্টি থাকে স্বীয় ত্রুটি ও দুর্বলতার দিকে। এর দ্বারা যেন আল্লাহ্ পাকের অবদানের শোকর আদায় করা সম্ভব হবে।

জীবনের শেষ পরিণতি বা খাতেমা সম্পর্কে কামিল ব্যক্তিরও নিশ্চিন্ত না হওয়া ঃ

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন আমি আমার শায়খের খিদমতে জিজ্ঞেস করলাম যে, ওলীর যখন একথা কাশ্‌ফ হয়ে যায় যে, তাঁর শেষ পরিণতি মঙ্গলজনক হবে, তখন তিনি কি পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও পরাক্রমশীলতার সামনে (যেহেতু আল্লাহ্ পাক কোন প্রকার বিধি–বিধানের আওতাভুক্ত নন।) যা তিনি চান তাই করতে পারেন। উচ্চ পর্যায়ের কাশ্‌ফ হচ্ছে, লাওহে মাহ্‌ফূজের লেখার উপর কাউকে অবগত করিয়ে দেয়া। যে ইলম আল্লাহ্ তা'আলার খাস ভান্ডারে রক্ষিত। কিন্তু হলে কি হবে? আল্লাহ্ পাক কোন বিধি বিধানের সাথে আটক ও সীমিত নন বিধায় তাঁর এ অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে লাওহে মাহফুজের লেখাটুকুও পরিবর্তন করে দেয়ার। এমনকি যদি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেও ফেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যদি নিশ্চয়তাও দিয়ে দেন যে, আমি তোমার উপর চুড়ান্তভাবে রাযী হয়ে গিয়েছি, আর নারায হব না, তখনও বিবেকবানের কাজ হবে না যে, সেদিকে ধাবিত হয়ে নির্ভয় হয়ে যাওয়া।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন উপরোক্ত কথার যৌক্তিকতা হচ্ছে, কাশ্‌ফ চূড়ান্ত ও নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কিন্তু তাঁর ভয় প্রতিশ্রুতির প্রতি অনিশ্চয়তার কারণে নয়। বরং আল্লাহর প্রতি আতংক বোধ এবং মহানত্বের কারণে হয়। আর তা হচ্ছে খোদা প্রদত্ত বিবেচ্য জিনিস। অনুধাবনের জন্য যুক্তি– প্রমাণই যথেষ্ট নয়।

আল্লাহর কাছে দোয়া করা সুন্নাত, কবুল হওয়া প্রধান লক্ষ্য নয়

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমি আমার শায়খকে একথা বলতে শুনেছি যে, এমনটি কখনো করো না যে, তাক্‌দীরের উপর ভরসা করে দোয়া করাটা ছেড়ে দেবে। দোয়া একটি ইবাদত এবং তা সুন্নত। চাই তা কবুল হোক আর চাই না হোক। খুবই চিন্তা করে বুঝে নিন।

যুহ্‌দ বা দুনিয়ার প্রতি অনীহা প্রদর্শনের ক্ষেত্র

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমি শায়খের নিকট থেকে একথা শুনেছি, যুহ্‌দ বা দুনিয়ার প্রতি অনীহা ভাবাপন্ন হওয়ার অর্থ-মাল ও দৌলতের দিকে আন্তরিক আকর্ষণ না হওয়া। এর অর্থ এই নয় যে, একবারেই মাল থাকবে না। কেননা নফসের আকর্ষণ মালের দিকে-এই জন্য হয় যে, এর দ্বারা নফসে প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা পূরণ হয়। তা না হলে দৌলত আকর্ষণীয় হওয়ার কিছু ছিল না। কেননা তা তো পাথর ইত্যাদি বিশেষ। আর যদি স্বয়ং মালেই যুহ্‌দ হত, তাহলে এমাল হাতে রাখার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হত। অথচ শরীয়ত আমাদেরকে এতে বাঁধা দেয়নি।

শায়খের সাথে সূক্ষ্ম আদব রক্ষা করা

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমি আমার শায়খের এ বাণী শ্রবণ করেছি, তিনি বলতেন, মুরীদ তার শায়খকে এ ফরমায়েশ করা যে "আমাকে একটু স্মরণে রাখুন" আদবের পরিপন্থী। আমি আবেদন করলাম, এখানে বেআদবীর কি আছে? তিনি বললেন, এতে শায়খের দ্বারা খিদমত নেয়া হচ্ছে। এতে আরো অভিযোগ ও রয়েছে যে, এ শায়খ যেন দরখাস্ত করা ছাড়া এদের দিকে দৃষ্টিই দেন না। আর শায়খকে এ নির্দেশ দেয়াটা উত্তম ছেড়ে অধমকে ধরারই নামান্তর। এটা আল্লাহর ধ্যানকে ছেড়ে সৃষ্টি ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া নয়কি? বরং মুরীদের জন্য করণীয় হচ্ছে, সে তাঁর শায়খের খিদমতে আত্মনিয়োগ করবে। আর আল্লাহ্ পাকেই তাঁর ওলীদের অন্তরে অবগতি রয়েছে। যখন তার সম্পর্কে মুরীদ তার ওলীর অন্তরে সে মুরীদের মহব্বত দেখবেন, তখন সেসব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মুদীদ তার

শায়খের কাছে আবেদন করেছে, আল্লাহ্ পাক নিজেই তার অভাব পূরণ করে দেবেন। কারণ ওলীর অন্তরে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো মহব্বত থাকাটা তার জন্য গায়রত বা মর্যাদা বোধের পরিপন্থী মনে করেন।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বাণীর সারকথা এই যে,মুরীদের খিদমতের কারণে তার মহব্বত যখন ওলীর ক্বলবে দাখিল হয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ পাক এটি আর পছন্দ করেন না যে, তাঁর ওলীর ক্বলব তাঁকে ছাড়া অন্য কোন দিকে সংযুক্ত থাকুক। অর্থাৎ, এমন এক ব্যক্তির দিকে ওলী আকর্ষিত থাকুক যার সম্পর্ক আজো আল্লাহর সাথে গাঢ় হয়ে ওঠেনি। তাই তিনি সে মুরীদকে আল্লাহ থেকে সম্পর্কহীন অবস্থায় থাকতে আর দেন না; বরং তাকে আল্লাহ্র সাথে জড়িয়ে সম্পর্কশীল করে নেন।

কামিলগণ ভয়ের ক্ষেত্রে ভয় পান কিন্তু আহ্লে হালগণ পান না কেন?

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন আমি আমার শায়খের কাছে আরজ করেছিলাম, আমরা কমিল বান্দাহদেরকে দেখেছি, তারা ভীতির অবস্থা যেমন হীংস্র জীব, যালিম ইত্যাদি হতে ভয় পান। কিন্তু আহলে হাল তথা খোদাপ্রেমে উম্মাদগণ তাদের থেকে তুলনামূলকভাবে নিম্ন পর্যায়ে থাকা সত্বেও তারা ভয় পান না কেন? শায়খ বলেন, কামিল তাঁদের নফসে দুর্বলতা ও গতিবিদ সম্পর্কে অবগত থাকেন। আর তারা সব সময়ই ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে আহলে হাললগণ উম্মাদানার দরুন স্বীয় নফসের দুর্বলতা খতিয়ে দেখার সুযোগ পান না। কখনো দাসত্বের গন্ডিতে আবার কখনো এর থেকে মুক্ত হয়ে যান।

প্রকৃতিগত ও খোদাপ্রদত্ত ইলমের নিদর্শন

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন। আমি আমার শায়খের কাছে শুনেছি, তিনি একাধিকবার একথা বলতেন, যার কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, আর তিনি জওয়াব প্রদানে চিন্তা করেন, তার এ জওয়াবে উপর আস্থা রাখার অনুচিত। কেননা তার এ জওয়াব চিন্তার ফসল। আল্লাহ ওয়ালা যারা হন, তাদের ইলম প্রকৃতিগত এবং খোদাপ্রদত্ত হয়ে থাকে কাজেই তাদের চিন্তা করার দরকার পড়ে না।

হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বাণীর অর্থ এই নয় যে, সে উত্তর মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ইলম ইসতিদলালী চিন্তা সাপেক্ষ ইলম হিসেবে এটিও একটি প্রমাণ। যেমন সাধারণ যাহেলী আলিমদের কথা ইলমে ইসতিদলালী বিধায় গ্রহণযোগ্য দলীল হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। হ্যাঁ কথা এটুকু যে, ইলমে বিজদানী বা খোদা প্রদত্ত ইলম হিসেবে বিবেচ্য হয় না। আর উপরোক্ত বাণী দ্বারা অর্থ এ-ও নয় যে, জবাব দানে বিলম্ব হলেই ইলমে বিজদানীর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে বরং যদি চিন্তা ও গবেষণার জন্য বিলম্ব হয় তখন তা বিজদানী ইলমের পরিপন্থী হবে, আর যদি যাওক বা প্রকৃতি ও রুচী আনয়নের স্বার্থে হয় তখন আর তা প্রকৃতিগত ইলম হওয়ার পরিপন্থী হবে না।

এক অবস্থাহতে অন্য অবস্থার দিকে বিবর্তিত হওয়ার ইচ্ছা না করা

আল্লামা শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমাকে আমার শায়খ এ অছিয়ত করেছেন, বিরাজমান অবস্থা হতে পরিবর্তন কামনা না করার জন্য। কেননা, যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দেয়া হয়, তাহেলে দেখা যাবে আলাহ্ পাক তোমাকে যে অবস্থায় রেখেছেন সে অবস্থাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন মনের সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে প্রসারতার কামনা করাও এ বাণীর প্রশস্ত পরিমণ্ডলের অন্তর্ভূক্ত।

শায়খ কর্তৃক মুরীদগণের পরীক্ষা নেয়া ঃ

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন ,আমি আমার শায়খকে জিজ্ঞেস করেছি। শায়খ কর্তৃক মুরীদকে পরীক্ষা করে নেয়া ভাল, নাকি মুরীদ হওয়ার পূর্বে পরীক্ষা না করা উত্তম ? কেননা সময়ে পরীক্ষা দ্বারা মুরীদদের গোপন দোষ–ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। যদ্বারা তার সঠিক অবস্থা নিরূপণ করে নেয়া সহজ হয়। তিনি বললেন–শায়খ কামলের জন্য পরীক্ষা করে নেয়া জায়েয। এদ্বারা মুরীদের অন্তরে মর্তবার যে দাবী লুক্কাইত রয়েছে, তা যেন আমার প্রতিপন্ন হয়ে যায় এবং সে এ অমূলক দাবী থেকে তওবা ইস্তগফার করে নেয়। কিন্তু অমাদের মতে শায়খ কামেল ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে এ জাতীয় পারীক্ষা নেয়া পছন্দনীয় নহে। আর আমরা এ মতের সমর্থকও নই। সুতরাং এ পর্যায়ে শায়খ কামেলের কর্তব্য হবে এমনসব বিষয়ে পরীক্ষা করা যদ্বারা মুরীদের সত্যতা প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে এমন বিষয়ে পরীক্ষা তিনি পরিহার করে চলবেন। যদ্বারা মুরীদের অন্তরালে লুক্কাইত দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার সম্ভবনা উজ্জল থাকে।

মেলামেশা ও নির্জনতার মাঝখানে ফায়সালা

হযরত শা'রানী (রহঃ) বলেন, আমি স্বীয় শায়খের কাছে জিজ্ঞেস করেছি জনসাধারণের সাথে মেলামেশা না করে নির্জনতা অবলম্বন করা

উত্তম, নাকি মেলামেশা করা উত্তম ? তিনি উত্তর দিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, তাদের পক্ষে মেলামেশাটাই উত্তম। কেননা, তাদের প্রতিটি মুহূর্তে দ্বীনের মা'রিফাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং সে নিজে যেমন এ ইলম দ্বারা উপকৃত হবে তেমনি অন্যরাও তার এলমে ম'রিফাতে-বরকত লাভে ধন্য হতে থাকবে। কিন্তু দ্বীনের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ্ পাক যাদেরকে দান করেননি তাদের বেলায় নির্জনতা অবলম্বন করা উত্তম। মেলামেশার কারণে তাকে যেন ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়।

উত্তর শুনলে ক্ষতি হবে এমন কেউ মজলিশে উপস্থিত থাকা অবস্থায় উত্তর দেয়া না দেয়ার হুকুম এবং পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য প্রশ্নকারীর জওয়াব না দেয়ার হুকুম

হযরত আল্লামা শা'রাণী (রহঃ) বলেন আমি আমার শায়খের কাছে জিজ্ঞেস করলাম আমাকে যদি কেউ মাসাআলা জিজ্ঞেস করে আর তখন সেখানে এমন লোক উপস্থিত থাকে যে অল্প জ্ঞানী হওয়ার দরুন জওয়াব শুনলে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে; এমতাস্থায় আমার করণীয় কি হবে? শায়খ বললেন, যদি তুমি এমন অবস্থার সম্মুখীন হও প্রশ্নকারীকে বলে দিবে, তোমার উত্তর অন্য সময় জেনে নিবে। কেননা, তুমি প্রশ্নকারীকে তার রুচিমত উত্তর দিতে গেলে তার পার্শ্বস্থ রুচীহারা ব্যক্তির ক্ষতি হবে। বিশেষ করে সে যদি জগড়া প্রিয় লোক হয়। আবার যদি পার্শ্বস্থ ব্যক্তির রুচীর নিরিখে উত্তর দিতে যাও তখন আসল প্রশ্নকারীর ফায়দা হবে না। অতঃপর তিনি বললেন হ্যাঁ যদি তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এমন ভাব উদয় করে দেন, যদ্বারা উপস্থিত সকলেরই ফায়দা হওয়ার সম্ভবনা থাকে তখন তাৎক্ষণিক উত্তর দেয়া উচিত হবে। আল্লাহ্ পাক মানুষকে প্রসারতা প্রদানকরী প্রজ্ঞাবান। অনেক ক্ষেত্রে এমন এমন ভাব পয়দা করে দেন তার ওলীগণের মনে, যাকারো জন্যই অনিষ্টকারী হয় না। সকলেরই অন্তরে স্বস্তি আসে।

আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আমার যদি জানা থাকে যে জিজ্ঞেস কারী আমাকে পরীক্ষা করার মন নিয়ে জিজ্ঞেস করছে ? শায়খ উত্তর দিলেন তাহলে জওয়াব দেবে বরং তুমি জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করবে জওয়াব দেয়ার ক্ষমতা তোমার হবে না। কেননা, পরীক্ষা যথাযথ জওয়াব প্রদানের পথ রুদ্ধ করে দেয়। যদিও এ উত্তর জওয়াব প্রদানকারীর অন্তরে সদা উপস্থিত থাকুক বা না কেন তবুও এ জওয়াব তাকে পরিচ্ছন্ন ও সন্তুষ্ট

করতে পারবে না। যেহেতু জিজ্ঞেসকারী বেআদবী করেছে। আল্লাহ পাক ক্ষমা প্রদর্শনকারী এবং দয়ালু।

গ্রন্থকার হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আসল কথা তো এটুকুই। তবে জওয়াব দাতার কাছে যদি জওয়াব প্রদানের কোন সঠিক কারণ থাকে, তখন জওয়াব দেওয়াটাও তার জায়েয হবে। যেমন জওয়াব না দিলে যদি উপস্থিত লোকদের কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। কিংবা জওয়াব দানের দ্বারা সে প্রশ্নকারীর কু-মতলবকে ধরিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ্ পাকই প্রকৃত শ্রবণকারী এবং ঘনিষ্টতম।

এ পর্যন্ত তৃতীয় প্রকারটির সমাপ্তি হল। এটি দিয়েই মূলবাণী সমূহের ইতি টানছি। আল্লাহ্ পাকের কাছে শুভ অবস্থা এবং পরিণামের দোয়া করছি। সমাপনীতে একটি রহস্য সামনে এলো। কিতাব শেষ করাটা চুপ থাকারই একটা শাখা বিশেষ। আবার এ শেষ বাণীটির কোথাও কোথাও চুপ থাকার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে।

এ রেসালার রচনা সাতাইশ জুমাদালউলা ১৩৫৫ হিজরীতে সমাপ্ত হয়।

আশরাফ আলী থানবী
(আল্লাহ্ তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য
(সকল গুনাহ্ মাফ করুন।)

আল্লামা ইবনে আরবী (রহঃ) কৃত শায়খ ও মুরীদগণের আদব

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। যিনি আমাদেরকে এদিকে হিদায়াত করেছেন। তিনি হিদায়াত না করলে আমরা কিছুতেই তা পেতাম না। হাজার দরুদ আমাদের সাইয়্যেদ আমাদের আশ্রয়ের স্থল নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর এবং বহু রহমত তাঁর পবিত্র আওলাদ আস্হাবদের উপর।

এ পুস্তিকায় তিনি তরীকাত ও সুলুকের সে সব নিয়মাবলী এবং আদাব বর্ণনা করেছেন, যা শায়খ এবং মুরীদ উভয়েরই জন্য আলোক বর্তিকা স্বরূপ। যেগুলো নিস্প্রয়োজনীয়তা ভাবার কারণে আজকাল তরীকতপন্থী এবং বড় বড় শায়খগণ আসাল পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়তে যাচ্ছেন। শুধু এটুকুই নয় যে, নিজেই তা থেকে দূরে আছে বরং ও সকল নীতিমালা থেকে অপরিচিতের সীমা এ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে, যদি কোথাও কোন বুযুর্গকে আকাবিরের তরিকার উপর প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় এবং তাঁদের বিবেচনা করা হয়। নানা ব্যঙ্গোক্তি ও কটাক্ষ করা হয়। থানাভুনের খানকাহ

শরীফে হযরত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হেকীমূল উম্মৎ হযরত মাওলানা আশরাফী আলী থানবী (রহঃ) এর সুলুকের প্রশিক্ষণ সব সময় স্বাভাবিকভাবেই আকাবিরের সে সব আদর্শ আদাবের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তবে প্রথা প্রচলনের আবর্তে সব সময় আসল হাকীকত ঢাকা পড়ে যায়। লোকজনের চিরাচরিত অভ্যাস যা তারা নেকের কাজকে বদে সুন্নাতকে বিদয়াতে এবং বিদয়াতে সুন্নাতে পরিবর্তিত না করে বুঝতে চায় না অনুরূপ তরীকতের আকাবিরগণের আদাব ও নিয়মনীতি দীর্ঘকাল যাবত দুনিয়া হতে বিলুপ্ত প্রায়। এমনকি যিকির ও অযিফা রত অনেকে তরীকতের মানুষ বরং কতিপয় মাশায়িখ পর্যন্ত সেসব নিয়ম নীতিতে বিদয়াত আখ্যা দিতে যেন প্রয়াস পেয়ে যাচ্ছে। আমি আল-হামদুলিল্লাহ অন্তর দিয়ে সেসব আদাব ও নিয়ম-নীতিকে ভাল মনে করছি। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে দলীল হিসেবে কিছু সামনে ছিল না। এমনকি অবস্থায় একদিন এ কিতাবখানা দৃষ্টিতে পড়ল। যেন এ বিষয়ের একজন ইমাম পেয়ে গেলাম। এসব নীতিমালা একত্রিত অবস্থায় সন্নিবেশিত দেখে অত্যধিক সন্তুষ্টি লাভ করলাম। আমি থানাভুন গেলাম এবং হযরত থানবীর (রহঃ) হাতে কিতাবখানা দিলাম। হযরত খুবই আনন্দিত হলেন এই জন্য যে, নীতিমালা যতগুলো নির্দ্ধারিত হয়েছিল ওগুলো এ বিষয়ে একজন ইমামের কলম দিয়ে লিখিত হয়েছে। আল্লাহরই প্রশংসা! তখন হতেই এই ইচ্ছা করে ছিলাম যে, কিতাবটিকে নিখুঁত উর্দুভাষায় অনুবাদ করে ছাপিয়ে দেয়ার। এই জন্য কাজটি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আর হযরতের নির্দেশানুযায়ী এর নামকরণ করা গেল "আল কাওলূল মাযবুত"

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

-বান্দা মুহাম্মদ শফী
খাদিম তালাবায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ।
৩, যিলহজ্জ ১৩৪৯ হিঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللهُ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। যিনি আমাদেরকে এদিকে হেদয়েত করেছেন। যদি আমদেরকে তিনি হেদায়েত না করতেন আমরা হেদায়েত পেতাম না। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ)-কে হুকুম করলেন ঃ

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

(অর্থ-এবং আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন)

তখন নবী (সঃ)-স্বয় স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহার আযাব হতে ভীতি প্রদর্শন করতে শুরু করেন। আর যে, জিনিসের তাবলীগের জন্য তাঁকে আদিষ্ট করা হয়েছিল উহার প্রতি আহ্বান করলেন। সুতরাং ইমাম মুসলিম নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ননা করেছেন। তিনি বলেছেন-নবী (সঃ) বলেছেন, "দ্বীন শুভকামনার নাম।" সাহবীগণ আরয করলেন কার শুভকামনা করা? নবী (সঃ) বললেন-আল্লাহর তাঁর কিতাবের রুসলের, মুসলিম শাসকদের, সাধারণ মুসলমানদের। অতঃপর নিকটতম আত্মীয়গণ শুভকামনা, শরীয়তের হুকুম এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রাপ্তির অপেক্ষাকৃত বেশী অধিকরী। আত্মীয়তা দুইটি শ্রণীতে বিভক্ত। **প্রথমতঃ**- বংশগত আত্মীয়তা; **দ্বিতীয়তঃ** দ্বীনি আত্মীয়তা। শরীয়তের দৃস্টিতে দ্বীনি আত্মীয়তা-ই গ্রহণযোগ্য। কেননা, নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন দুই ধর্মে বিশ্বাস ব্যক্তির মধ্যে এক অপরের উত্তরাধিকার হয় না। সুতরাং যদি দ্বীন না থাকে। তবে বংশীয় অত্মীয়তাও উত্তরাধিকারিত্ব প্রদান করে না। হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) বলেন, এ ভাবটি আরীফ শীরাযী (রাহঃ) তাঁর লিখার নিতান্তই সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। যথা ঃ

هزار خويش كه بيگانه از خدا باشد -
فدائے يك بيگا نه كا شنا با شد

এমন হাজারো আপনজন যারা আল্লাহর দুশমন,
বাঁধা নেই তার হোক কুরবান, বিনিময়ে মাত্র এক দ্বীনি জন।

নোট- এই অনুবাদ হযরত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হেকীমুল উম্মাত থানবী (রাহঃ) পুরোপুরি দেখছেন, সংশোধন করেছেন এবং উপকারী বহু টীকাও তিনি সংযোজন করেছেন। যেসব টীকায় আমার হাওয়ালা নেই, সেসব গুলো থানবী (রহঃ) - এর ভাষা।

নিবেদক- অনুবাদক ঃ

[মুফতী সাহেব (রহঃ)]

আমাদের শায়খ আবুল আব্বাস (রহঃ) এদিকে একটি সুক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন। সেটি হচ্ছে, আমি একদিন তার খেদমতে গিয়ে ছিলাম এবং আরয করেছিলাম ঃ

اَلْاَقْرَبُوْنَ اَوْلٰى بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ ঃ বাদন্যতা ও দয়া প্রদর্শনের জন্য ঘনিষ্টরাই অপেক্ষকৃত বেশী অধিকারী। তিনি বললেন,-ঘনিষ্ট যারা "আল্লাহর দিকে" তারাই অধিকারী। (১)

আল্লাহ পাকের ঘোষণা – اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

"ঈমানদারগণ পরস্পর ভাই ভাই"

সুতরাং ঈমান প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও প্রমাণ হয়ে যায়। ভ্রাতৃত্ব প্রমাণের অন্তরালে দয়া-অনুগ্রহ ও যথার্থই প্রমাণ হয়ে যায়। দয়ার সর্বোত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে ভাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাযত করে জান্নাতে অধিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মুর্খতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোয় সুসজ্জিত করে তোলা, লজ্জার পথ থেকে পরিত্রাণ দিয়ে প্রশংসার পথে পরিচালিত করা এবং হীনতা থেকে মহত্বের দিকে অনুপ্রাণিত করা।

কেননা, কোন ব্যক্তিই তার ঈমানে পরিপূর্ণতা আনতে পারবে না যে পর্যন্ত তার জন্য পছন্দকৃত বস্তুটি তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবো। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার কিতাব মুসলিম শরীফে বর্ণনা করেছেন । সমস্ত মুসলমান পরস্পর একটি হাতের সমতুল্য। আর এক মুসলামান অন্য মুসলামানের জন্য বাড়ীর ইমারতের ন্যায়। একটি ইটের দ্বারা আরেকটি ইঁট শক্তি সঞ্চয় করে। নবী (সঃ) এর এসব বাণীর প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে অলসতা হতে সজাগ করা অজ্ঞতার অমাবস্যা হতে জাগরিত করে দোযখের গুহা থেকে এদেরকে নাজাত দেয়ার চেষ্টা করা ওয়াজিব ও কর্তব্য ।

অতঃপর মুসলমানগণের কত গুলো শ্রেণী বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে একটি স্তরের নাম "তাসাওউফ"; যা এক সম্পদায় ইখ্‌তিয়ার করেছে। যাদেরেকে সুফিয়ায়ে কিরাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এঁরা আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেন। তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে সমস্ত সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দেন। অনুদবাদক মুফ্‌তী শফী সাহেব (রহঃ) বলেন ঃ এদের দৃষ্টিতে একথাই স্বতঃসিদ্ধ বলে বিবেচিত হয় –

টীকা ঃ (১) এ কথার অর্থ এই নয় যে, কোন আত্মীয় দান ও দয়ার অধিকারী নয়; বরং দয়া প্রাপ্তির অধিকারী দ্বীনের দিক দিয়ে ঘনিষ্ট যারা তারাই তুলনামূলক বেশী। অন্যথায় এদের প্রতি দয়া দর্শালেও সওয়াব হবে।

مَاعِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ–

অর্থাৎ ঃ তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তাই অবশিষ্ট থাকবে।"

নিম্নোক্ত কবিতাটি এ প্রসঙ্গে আমাকে খুবই আনন্দিত করেছে।

لِكُلِّ شَيْئٍ اِذَافَا رَقْتَهُ عَوْضٌ – وَلَيْسَ لِلّٰهِ اِنْ فَارَقْتَ مِنْ عَوْضٍ

প্রতিটি বস্তুই বিচ্ছেদের পর থাকে তার বিকল্প, কিন্তু আল্লাহর থেকে বিচ্ছেদ হলে তার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নাই ।

চাল-চলন ও মতামতের দিক দিয়ে মুসলমানগণ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি শ্রেণী তার দাবীতে সে সত্যবাদী এবং এদের বাস্তব ও হাকীকত আছে । দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এমন একটি শ্রেণী যাদের হাকীকত বলতে কিছু নেই। সুতরাং কারাবত বা ঘনিষ্টতা প্রতিটি শ্রেণীর তাদের ধ্যান ধারণা ও দৃষ্টি ভঙ্গির দৃষ্টিতে হয়ে থাকে। যদিও এদের দাবী ভিত্তি হীনই থাকুক না কেন।

সুতরাং আমাদের এটা অপরিহার্য যে, আমরা তাদের নিকটত্মীয় এবং আপনজন বিধায় তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভীতি প্রদর্শন করা এবং মুসলমান হিসেবে তাদের শুভাকঙ্খী হওয়া। আর ভাই হিসেবে তাদের উপর অনুগ্রহ করা।

তরীকতই মূলত ঃ সীরাতে মুস্‌তাকীম বা সঠিক রাস্তাঃ

খুব বুঝে নিন, এ তরীকত আল্লাহর রাস্তা। সে সীরাতে মুস্‌তাকীম যা সীরাত বা রাস্তার চেয়ে বড় এবং মহান। কেননা রাস্তার উৎকৃষ্টতা এবং নিকষ্টতা নির্ভর করে তার লক্ষ্য গন্তব্যস্তলের উপর। যখন এ তরীকতের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, যিনি সবকিছুর চেয়ে মহান ও মর্যাদাশালী , যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। এজন্য তার রাস্তাটি হচ্ছে উত্তম ও উৎকৃষ্ট রাস্তা। যে ব্যক্তি এ পথের পথ প্রদর্শক-তিনি অন্যান্য পথ প্রদর্শকের দিশারী ও পথিকৃৎ। আর যারা এ পথের যাত্রী, তারা অন্য পথের পথচারীদের তুলনায় সৌভাগ্যশালী এবং কল্যাণময়। এজন্য সুধীজনদের জন্য সমীচীন হবে তারা এপথ ছাড়া সব পথ বর্জন করা। কেননা এ পথে সংযুক্তি রয়েছে অনন্ত সৌভাগ্য এবং শান্তির সাথে। একথা বুঝে রাখুন! আল্লাহর পথের যাত্রীগণ দু'ধরণের হয়ে থাকেন। একদল হন সাদিক বা সৎদের; দ্বিতীয় দল

সিদ্দীক বা অত্যাধিক সৎ। অর্থাৎ এক দল হন অণুসারী এবং অপর দল হন অনুসরণীয়। অনুসারীগণকে বলা হয় মুরীদ কিংবা সালিক বা শাগরিদ অনুসারী হন যাঁরা তাঁদেরকে বলা হয়–শায়খ, উস্তাদ, মুয়াল্লিম। শায়খ দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সেসব লোক যারা শায়খ, মুয়াল্লিম হওযার যোগ্যতা রাখেন। চাই বর্তমানে পীর হোন আর না –ই হোন। আর আমার উদ্দেশ্য এ কিতাব দ্বারা হচ্ছে পীর হোন শায়খের স্থান এবং তার আনুষাঙ্গিকতা ও আদাবসমুহ এব মুরীদের স্থান এবং তার পারিপর্শ্বিত ও প্রয়োনীয় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা। তরীকত পথের যাত্রীদের পারস্পারিক আমলের জন্য সেগুলোর দরকার হয় এবং আল্লাহর পথে চলা কালে করণীয় হয়। এই জন্য আমি কিতাবটির নাম করণ করেছি ' আল –হুক্‌মল মারবুত ফী মা ইয়ালযামু আহ্‌লা তরীকিল্লাহি তাআলা মিনাশ শুরুত"। কেননা বর্তমান সময়টি যাবতীয় বাতিলও মিথ্যা দাবীতে ভরপুর।

এখন না আছে কোন সঠিক ও দৃঢ় মুরীদ। আর না দেখা যায় কোন মুহাক্কিক পীর। যিনি মুরীদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী হবেন। যিনি মুরীদের প্রবৃত্তির কলূষ ক্রুটি সমূহ বের করে দেবেন। হকের পথ তার সামনে প্রকাশ করে দেবেন যিনি। যদ্দরুন আজকাল মুরীদ অহংকারের দাবীদার হয়ে পড়ে। এসব ধাঁ ধাঁ ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়।

তরীকতের পথে শায়খের প্রয়োজনীয়তা

স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রদানকরীর মর্যাদা যথাক্রমে নবুওয়াতে অথবা নবুওয়তের পূর্ণ উত্তরাধিকারিত্বের মর্যাদ। (১) এ মর্যাদায় যিনি বিভূষিত হবেন নবুওয্যতের সময় কালে, তিনি নবী হিসেবে আখ্যায়িত হবেন। আর নবুওয়্যাতের উত্তরকালে শায়খ উস্তাদ এবং ওয়ারিছ হিসেবে আখ্যায়িত হবেন। যারা ওলামায়ে হক নামে পরিচিত। আর তাঁরা যত বড়ই হোক না কেন নবীর দরজায় পৌছতে পারবেন না। (২) শায়খ এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাসাওউফের

টীকা ঃ (১) এ আলোচনায় এ সংশয় আসা কি হবে না যে, উপরোক্ত দুইটি প্রকারের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, নবুওয়্যাতে সময় দাওয়াতের ভার যার উপর আসবে তিনি নবী, আর এর পর যার উপর ন্যস্ত হবে তিনি গায়রে নবী। পক্ষান্তরে গুণগত পার্থক্য আরো বহু কিছু রয়েছে এ দুটির মাঝখানে যা বর্ণনাতীত ।

টীকা ঃ (২) শায়খের উপরোক্ত বাণী দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, নবী (সঃ) – এর পর কোন প্রকার নবীরই নবুওয়াত অবশিষ্ট সেই। ফুতুহাত এ কাথা কারো দ্বিধা আসতে পারে বিধায় এখানো তা আনা হয়নি। আল্লামা শা'রানী (রহঃ) এমনি বলেছেন তার প্রণীত কিতাব ইয়াওয়াকীত– এ ।

আকাবিরিনদের উক্তি প্রণিধানযোগ্য মনে করি। "যার কোন শায়খ বা উস্তাদ থাকবে না, তার শায়খ হবে শয়তান।" (৩) নবী (সঃ) –এর উস্তাদ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। আল্লামা হারবী (রহঃ) এ তথ্য স্বীয় গ্রন্থ 'দারাজাতুত্‌তায়িবীন ' এ বর্ণনা করেছেন।

আর এই রেওয়ায়েত আল্লামা শায়খ শরীফ জামালুদ্দীন ইউনুস ইবনে ইয়াহ ইয়া থেকে ৫৯৯ হিজরীতে বায়তুল্লাহ্ শরীফের 'রুকনে য়ামানী'–এর সামনে আমার হাসিল হয়েছে। যেটি তিনি আমার কাছে স্বতন্ত্র এক সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। সে হাদীস হচ্ছে, আল্লাহ্ পাক এক ফেরেশতা কে নবী করীম (সঃ)–এর কাছে প্রেরণ করলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) নবী (সঃ) এর কাছে পুর্বেই গমণাগমণ করতেন। সে ফেরেশেতা নবী (সঃ) কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ্ পাক আপনাকে দুইটি পথের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করেছেন। আপনি যদি চান আবদ বা দাসসুলভ নবী হতে, তাও পারেন। আর যদি সম্রাট সুলভ নবী হতে, তাও হতে পারেন। অর্থাৎ আপনি নবী তো থাকবেনই, সাথে সাথে সম্রাটও থাকতে পারেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী (সঃ)–কে ইঙ্গিতে বললেন আপনি বিনয় ও নম্রতার পথ অবলম্বন করুন। যদ্দরুন নবী (সঃ) উওর করলেন, আমি দাসসুলভ নবী হতে ইচ্ছুক। এ হাদীসখানার অবতারণা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যে নবী (সঃ) কে তালীম দিয়েছেন তা প্রমাণ করা। আর এটিও সাব্যস্ত করা, জিবরাইল আমীন যেটিকে প্রধান্য দিয়েছেন এবং পছন্দ করেছেন, নবী (সঃ)ও সেটিই পছন্দ করলেন। সুতরাং আলোচ্য হাদীসের হযরত জিবরাঈল (আঃ) ও একজন শিক্ষাদাতা শায়খের আসনে অধিষ্ঠিত। আর নবী (সঃ) ছিলেন একজন অধ্যয়নকারীর আসনে আসীন।

অনুবাদক হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহঃ) বলেন, এখানে কারো এ প্রশ্ন আসা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, হযরত জিব্রাঈল আমীন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী (সঃ) হতেও উত্তম; যা মুসলামানদের আকীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী । কেননা নবী (সঃ)–এর প্রকৃত তালীমদাতা ও আদব প্রদাতা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সুবহানাহু। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হচ্ছেন মাধ্যম ও দূত বিশেষ।

টীকা ঃ (৩) উপরোক্ত বাণীকে অনেকে –ই হাদীস হিসেবে মনে করে থাকেন কিন্তু হযরত শায়খ তাঁর তাহকীক ও তত্ত্বজ্ঞানকে এ ব্যাপারে যথাযথ সদ্ব্যহার করেছেন। তিনি এটিকে হাদীস বলেননি । বরং তিনি মাশায়িখদের উক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

হ্যাঁ বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনি তালীম দাতা ও শায়খের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিম্নোক্ত হাদীসে আমার একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। যা মূল কিতাবেই কয়েক লাইন পরে বিবৃত হয়েছে।

إِنَّ اللهَ اَدَّبَنِى فَاَحْسَنَ اَدَبِى

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ পাকই আমাকে আদব শিখিয়েছেন এবং তিনি উত্তম আদব দান করেছে। আর এ উদ্দেশ্যের স্বপক্ষে নবী করীম (সঃ) –কে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ - اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ
فَاِذَا قَرَاْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ -

অর্থাৎ ঃ দ্রুত মুখস্ত করার উদ্দেশ্য এ কুরআনের সাথে জিহ্বাকে বেশী নাড়াবে না। অবশ্যই এ কুরআন সংকলন ও পাঠ দানের দায়িত্ব আমার উপর রয়ে গেল।

সুতরাং আমরা যখন তা পাঠ করব, আপনি তা অনুসরণ করুন।"

নবী করীম (সঃ) আরো এরশাদ করেছেন–আল্লাহ পাক আমাকে আদব শিখিয়েছেন এবং উত্তমরূপে শিখিয়েছেন।

মোটকথা হচ্ছে, এ হাদীসের আলোকে একথা জানা গেল যে, তরীকতের পথযাত্রীর জন্য আদব দাতার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাসাওউফের পরিভাষায় এ আদব দাতাকে উস্তাদ ,মুয়াল্লিম এবং শায়খ হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়।

এ তরীকতের পথ নিতান্তই সম্মান ও ইয্যতের পথ। ফলে এ পথে মানুষকে বিনষ্টকারী অবর্ণনীয় প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকুলতা বিদ্যমান রয়েছে বিধায় এ কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথের যাত্রী হওয়ার ক্ষমতা তারই রয়েছে, যে হবে সাহসী, দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন এবং সক্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকরী। এমতাবস্থায় সে যাত্রীর সাথে যদি একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক থাকেন, তাহলে সে পথে চলার উপকারিকতার বিকাশ সম্ভব হয়। এ জন্যই শায়খের দায়িত্বে এটি অপরিহার্য যে তিনি তাঁর তালীম ও আদব দানের দায়িত্বটুকু যথাযথ আদায় করবেন।

আর মুরীদের কর্তব্য হল সে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করবে। একথা ধর্তব্য যে, কারো পীর কিংবা সংশোধনকারী হওয়াই জীবনের মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শায়খ নিজেও ঐ দরজা ও নৈকট্যের সন্ধানী, যেটি তাঁর অর্জিত হয়নি। কারণ আল্লাহ পাক নবী (সঃ) কে ইরশাদ করেন–

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

"হে নবী আপনি দোয়া করুন –হে আমার পরওয়ারদেগার আমার ইলম বাড়িয়ে দিন।"

এ জন্যই শায়খ এবং উস্তাদের এ জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে যে, অন্তরে আগত ও জাগ্রত জিনিসের কোনটি নাফস ও শয়তান থেকে চক্রান্ত স্বরূপ আসছে আর কোনটির উদ্ভব আসমানী ও ইলাহী সূত্রে ?

মূল অনুবাদক হযরত মুফতি শফী সাহেব (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বাণীর তাফসীল হচ্ছে, হাদীসে নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, "প্রতিটি মানুষের কৃলবে নিয়োজিত রয়েছে একটি শয়তান এবং একজন ফেরেশতা সুতরাং কৃলবে যে নতুন কথা ও খেয়ালের উদ্ভব হয়, তা কখনো শয়তানের পক্ষ হতে আর কখনো ফেরেশতার পক্ষ হতে উদ্ভব হয়ে থাকে। মুসলিম শরীফ।

এটিকেই "শায়তানী ও রাব্বনী খাতরাত " দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, শায়খ যিনি হবেন, তাঁকে এ উদ্ভাবিত বস্তুদ্বয়ের মাঝখানে তারতম্য করার অনুধাবন ক্ষমতা অবশ্যই রাখতে হবে। অর্থাৎ এ ধারণা ও খেয়ালের আসল উৎস কোথায় বা কি? এটুকু তাঁকে আবশ্যিক রূপে জানতে হবে।

আর শায়খকে জানতে হবে, এসব আগত ও জাগ্রত খেয়াল –এর বাহ্যিক নিরামক কি? এগুলোর মধ্যে কি কি দোষ-ত্রুটি রয়েছে তা সম্পর্কে তাঁকে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। নাফস ও শয়তানের পক্ষ হতে আগত মনের ধারণা ও খেয়াল তো স্বভাবগতভাবেই সরাসরি অনুমেয়। কিন্তু কখনো কখনো আসমানী ও রাব্বানী তরফ থেকে আগত বস্তুর মধ্যেও বিভিন্ন আনুষঙ্গিকতার কারণে নানাবিধ ব্যাধির মিশ্রণ ঘটে। শায়খের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বকে এ সবগুলো সম্পর্কেই জ্ঞাত থাকা একান্ত আবশ্যক।

এ বিষয়ও শায়খকে জেনে রাখতে হবে, রূহের পীড়া ও ব্যাধিগুলো প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও তার ধরণ ও তথ্যগুলি কি কি? আর তা ব্যবহার ও সেবন করানোর উপযুক্ত সময় সম্পর্কেও থাকতে হবে পারদর্শিতা। এনমকি মুরীদগণের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্নতার দরুন তাদের অবস্থার বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন এ তরীকতের পথে অগ্রযাত্রায় কারো বাঁধা থাকে পিতা-মাতার সম্পর্কের, কারো সন্তান-সন্তনির, আবার কারো রাজা-বাদশার। এসব সম্পর্কে পীর বা শায়খকে তীক্ষ্ম অভিজ্ঞতা রাখতে হবে। তাদের অবস্থা ও যথোচিত ব্যবস্থা কস্নার দায়িত্ব কার ? এ শায়খেরই। এর পরই তিনি রোগী মুরীদকে এসবের খপ্পর থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হতে পারেন। অন্যথায় নয়। আর এসব কার্যকর হবে তখন, মুরীদ যখন আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ো যাবে। আর যদি তার কোন আসক্তি এ দিকে না থাকে, তবে আর কোন উপকারিতার আশা করা যায় না।

শায়খের আদব বা করণীয় ঃ

শায়খে আকবর (রহঃ) তাঁর এ কিতাবে শায়খের আদবের স্থলে 'শরূত' ব্যবহার করেছেন। এ জন্য আমিও সে আদবের নাম 'শর্ত হিসাবেই নির্বাচন করলাম। (অনুবাদক)

১ নং শর্ত ঃ শায়খের জন্য করণীয় হল তিনি মুরীদকে আযাদ ও স্বাধীন ছাড়তে পারবেন না। অর্থাৎ, মুরীদ যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবে এভাবে চলতে তাকে না দেয়া বরং মুরীদ যক্ষুনি বাড়ী হতে কোথাও বের হতে চাইবে, অনুমতির মাধ্যমে বের হবে। আর যে কাজের জন্য যাবে শায়খের হুকুম নিয়ে যাবে।

২ নং শর্ত ঃ মুরীদের ত্রুটিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দেয়া, সতর্ক করা এবং শাসন করা। এতে অনুকম্পা প্রদর্শন কিংবা নমনীয়তা অবলম্বনকে আদৌ প্রশ্রয় দেয়া সঙ্গত হবে না। ক্ষমা প্রদর্শন (১) করলে সে পীরের দায়িত্ব একটুও আদায় হবে না বরং তিনি এমন একজন বাদশাহ্‌ যিনি তার প্রজাদের প্রতি খেয়ানত করে যাচ্ছেন। আর তাঁর প্রতিপালকের মহানত্ব ও পরাক্রমশালিতার প্রতি কিঞ্চিত ভ্রুক্ষেপও করছেন না। অথচ নবী (সঃ) এরশাদ করেন– مَنْ اَبْدٰى لَنَا مَفْحَتَهٗ اَقَمْنَا عَلَيْهَا الْحَدَّ

টীকা ঃ (১) ক্ষমা দ্বারা এখানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণগত ক্ষমা।

"যার অপরাধ আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে, আমরা তার উপর হদ্দ বা শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করে ছাড়বো।" অনুরূপ মুরীদের ভুল–ভান্তি প্রকাশ পেলে শায়খ কর্তৃক শাসকে ভুমিকা নিতে হবে।

৩ নং শর্ত ঃ শায়খের আদব এটিও যে, তিনি মুরীদের থেকে এ অঙ্গিকার নিবেন যে, সে যেন তার কোন প্রকার আত্মিক রোগ কিংবা গুপ্ত হালাত শায়খের কাছে লুক্কায়িত না রাখে। চিকিৎসক যদি ঔষধ ও ঔষধের অনুপানের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হন এবং ঔষধের গঠন ও গড়ন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই না রাখেন তা হলে এমন চিকিৎসক রোগীর জন্য সর্বনাশা হবেন। এজন্য আকৃতিগত অভিজ্ঞতা অর্জন না করে গুণ ও প্রক্রিয়াগত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যদি ঔষধ বিক্রেতা রোগীর শত্রু হয়, আর সে যদি চায় রোগীকে বিনাশ করে দিতে, তখন চিকিৎসক অবস্থা অনুপাতে ঔষধ সম্যক জ্ঞান না রাখেন এমতাবস্থায় যদি সে শত্রু ঔষধ বিক্রেতা জীবননাশক কিছু একটা দিয়ে দেয়, আর চিকিৎসক অনভিজ্ঞতা হেতু তা-ই নিয়ে উপস্থিত করে দেয় রোগীর কাছে, তা হলে এতে রোগী মৃত্যুবরণ করলে প্রতিক্রিয়া সে ঔষধ বিক্রেতা ও চিকিৎসক উভয়ের প্রতি সমভাবে বর্তাবে। কেননা চিকিৎসকের করণীয় ছিল রোগীকে তিনি এমন জিনিস সেবন না করানো, যেটির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তার সম্যক জ্ঞান নেই। শায়খের অবস্থাও তদ্রুপ। তিনি যদি সম্যক অভিজ্ঞতা ও সঠিক রুচীসম্পন্ন না হন, যদি হন এ পথে পরিচিত হাসিলকারী শুধু পুঁথিগতভাবে অথবা এমনি-ই যদি তিনি অপ্রতুলভাবে মর্যাদা ও সম্মানের লোভে মুরীদদের সংশোধন ও শুদ্ধিকরণের আসনে অসীন হয়ে যান, তখনি তিনি মুরীদদের রক্ষক না হয়ে হবেন ভক্ষক। কেননা, তখন তার মুরীদদের গমণাগমণ ক্ষেত্র, বিচরণ কেন্দ্র, এবং অবস্থার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বিষয়ক কোন অভিজ্ঞতা -ই তাঁর থাকবে না। এ প্রেক্ষিতে শায়খকে সমভাবে তিনটি জিনিসের সম্যক ধারণা রাখতে হবে। নবীগণের দ্বীন, ডাক্তারদের ব্যবস্থা জ্ঞান এবং প্রশাসকবর্গের প্রশাসন ক্ষমতা। তখন তাকে উস্তাদ বলা ঠিক হবে। এমতাবস্থায় শায়খের জন্য প্রয়োজন হবে কোন মুরীদকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকে গ্রহণ না করা।

৪ নং শর্ত ঃ শায়খের কর্তব্য হল মুরীদের প্রতিটি নিশ্বাস ও কাজ কর্মের হিসাব নেয়া। মুরীদ যত বেশী তাবেদার হবে সে অনুপাতে তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা। কেননা এ রাস্তা মূলতঃ আত্মত্যাগ অধ্যবসায়

এবং আত্মনিবেদনের। এ পথে নম্রতা বা কোমলতার কোন সুযোগ নাই। কেননা, উদারতা প্রদর্শন সাধারণের ব্যাপারে প্রযোজ্য হয়। বিশিষ্টদের ব্যাপারে নয়। সাধারণ জনের তো এটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের জন্য মুসলিম ও মুমিন নামটুকু কেবল এসে যাক। তারা কেবল আল্লার দেয়া ফরযটুকু আদায় করাই যথেষ্ট ও নিজেকে ধন্য মনে করে। আর যে ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদার সন্ধানী হয়ে সর্বসাধারণে স্তর অতিক্রম করতে আগ্রহী, তার জন্য আশ্যক হল, সে জিনিস হাসিল করতে ত্যাগ তিতীক্ষা বরণ করে নেয়া।(১)

আর যে ব্যক্তি গলায় মুক্তার মালা দেখতে চায়, তার জন্য করণীয় হবে সমুদ্রের তলদেশের যতসব অন্ধকার ও ঘোর কালিমা আছে, ওগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়া। আর তারই সাথে জীবনাত্মা তথা শ্বাস-প্রশাসে গতিধারাকে সচল করে দেয়া। এর দ্বারা আমাদের আলোচ্য দাবীটুকু যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণিত হল। আমাদের ইমাম আবু হানিফা মুদায়্যান বলেছেন, মুরীদগণের আবার বিরতি রুখছত এবং বিশ্রামের সুযোগ কোথায়, আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত ইরশাদ লক্ষণীয় -

وَالَّذِيْنَ جَا هَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -

"যারা আমার হুকুম পালনে ত্যাগ স্বীকার করেছ, তাদের সরল সঠিক পথের দিশা অবশ্যই দিয়ে থাকি।"

এখন তোমারা ভেবে দেখতে পার তোমরা কোথায় পড়ে আছ। সুতরাং মুজাহাদাহ্ বা সংযম ছাড়া সঠিক পথ পাওয়া যাবে না। সুতরাং তোমরা বিরামহীনভাবে স্বীয় গতিপথে চলতে থাকতে হবে। এপথ অতিক্রম করা তোমাদের জন্য ভ্রমণ বিশেষ। অথচ সফর বা ভ্রমণ শাস্তি যে খন্ডতুল্য তা অনস্বীকার্য। কেননা মুসাফির তার সফরে সাধারণতঃ একটি কষ্ট পেরিয়ে আর একটি কষ্টের দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। তা হলে আর শান্তি ও বিরামে ফায়দা কি?

টীকা ঃ (১) এটি ছিল সে কালের সুলূকের নবযাত্রীদের অবস্থা। আজকাল তো ফরযের পরিশ্রম, যা তেমন কষ্টের কিছু নয় –বরদাশত করতেও রাজী নয়। এ ব্যাপারেও শায়খের শাসনকে কষ্টকর মনে করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে ফরযগুলো তারা বাহ্যতঃ আদায় করছে। তাও অন্তরাত্মা নিয়ে নয়। আর এতেই তারা ফরয সীমিত মন করে।

৫ নং শর্ত ঃ পীর বা শায়খ হওয়ার পথে এটিও একটি শর্ত যে খাঁটী দ্বীনদার পীরের ইজাযাত ও অনুমতি প্রদত্ত হওয়ার পর মুরীদ করানোর দায়িত্ব নেয়া এবং করা; নতুবা নয় কিংবা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বরং তার উপর ইলহাম করে দেয়া। (১) আর পূর্ব থেকেই তার সাথে আল্লাহ্ পাকের এ আচরণ চলে আসছে যে, কোন শায়খ বা পীরের মাধ্যম ছাড়াই তার তারবীয়াত ও শুদ্ধিকরণের কাজ চলে আসছে।

৬ নং শর্ত ঃ পীর বা শায়খ হওয়ার অপর শর্ত এই যে, তাঁর মধ্যে এ স্বভাব আসতে হবে যে, কোন কালাম বা কথা রাখার সময় কেউ ঝগড়া বা বিতর্ক ওঠাতে চইলে সে ক্ষেত্রে কথা বন্ধ করে দিবে। এ জন্যই হযরত সূফীয়ায়ে কিরাম ঝগড়াকারীদের সঙ্গে কথা বলতেন না। কারণ, তাঁদের ইলম কখনো বাক-বিতন্ডা সহ্য করে না। কেননা তাঁদের এ ইলম মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সঃ)–এর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। অথচ হযরত (সঃ) এ সামনে কোন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলে তিনি এরশাদ করতেনঃ নবীর সামনে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। এ রহস্য হচ্ছে এই, আল্লাহ্ পাকের মা'রিফাত এবং ইলাহী বাণীসমূহের সূক্ষ্মতা অনেকাংশেই আকল ও যুক্তির ধরাছুঁয়ার উর্ধ্বে অর্থাৎ বুদ্ধি –বিবেক তার প্রক্রিয়া ও যুক্তিকতা দ্বারা ওগুলোকে আয়ত্বে আনতে অপারগ হয়ে পড়ে। যদিও এ বুদ্ধির মধ্যে উপলব্ধি করার মত খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা সঞ্চিত থাকে। সুতরাং যুক্তি-তর্ক যখন এক্ষেত্রে অনেকাংশেই অকেজো বলে প্রতীয়মান হল, তাই একটি মাত্র মাধ্যম 'কাশফ ছাড়া তা হাসিল করার আর কোনটি বা অবশিষ্ট নেই। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মুশাহাদাহ্র মাধ্যমে কেউ কোন উক্তি করলে শ্রোতার পক্ষে তাতে প্রতিবাদ বা বিতর্ক করা সঙ্গত আচরণ হতে পারে না। বরং তরীকতের নিয়মানুসারে এমতবস্থায় দুইটির যে কোন একটি কাজ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সে ব্যক্তি কাশফ হাসিলকারী পীর সাহেবের মুরীদ হলে মনে প্রাণে তাস্দীক তথা সত্যরূপে বিশ্বাস করা তার জন্য ওয়াজিব। আর যদি মুরীদ না হয় তা হলে শুধু তাসলীম তথা মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ওয়াজিব। তাসলীম করার অর্থ হচ্ছে, মনে প্রাণে কথাটি মানার মত যদি না-ই হয়, তাহলে কমপক্ষে তা নিয়ে বিতর্ক পরিহার করা। বরং সেখানে নীরবতা অবলম্বন তার করণীয়

টীকা ঃ (১) হযরত কুদ্দিসা সিররুহু বলেন, ইলহামের দাবী করলেই যথেষ্ট হবে না। তার সমসাময়িক আল্লাহ ওয়ালাগণ এ ইলাহামকে মেনে নিতে হবে কিন্তু।

ও শোভনীয়। কেননা, মুরীদ তার পীর বা শায়খের কথাকে যাবত সত্য বলে আকুণ্ঠ বিশ্বাস করতে না পারবে, তার কামীয়াবীর আশা করা যেতে পারে না। যখন তোমরা কোন পীর সাহেবকে দেখবে তিনি তাঁর মুরীদকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছেন, যদ্দরুন মুরীদ তার শায়খের উক্তির বিপক্ষে নকলী ও আক্‌লী যুক্তি পেশ করে। আর শায়খ তাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলছেন না বা বিরত রাখছেন না, তাহলে ভেবে নেবে যে, এ পীর সাহেব তার তারবীয়াতের দায়িত্বে খিয়ানত করে যাচ্ছেন। কারণ মুরীদ স্বীয় মুশাহদাহ ছাড়া অন্য কোন যুক্তিতে কথা রাখা অনুচিত বৈ কিছুই নয়। এখনো মুরীদের এ যোগ্যতা আসেনি যে, বিপক্ষে কথা রাখতে পারে কাজেই তার জন্য চুপ থাকাই উত্তম। এ জাতীয় ব্যাপারে রায় বা যুক্তিগত স্বতন্ত্র চিন্তা রাখা একান্ত বর্জনীয়। অর্থাৎ যুক্তি-প্রমাণের চিন্তা করা নিতান্তই পরিত্যজ্য। এটা বরং স্বীয় ধ্বংসকে টেনে আনে, দূরত্বের আবরণকে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্ পাকের সানিধ্য থেকে বঞ্চনার পথ উম্মুক্ত করে দেয়। শায়খের জন্য এটি–ই উত্তম হবে যখন তিনি কোন মুরীদকে দেখবেন, সে যুক্তি-প্রমাণে স্বীয় বিবেক–বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে আগ্রহী আর শায়খের বাতলানো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দিচ্ছেন। তাহলে এমন মুরীদকে নিজের মজলিস কিংবা খানকাহ্ হতে বের করে দেয়া উচিত। কারণ তার কারণে অন্য মুরীদদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। তার নিজের তো কামিয়াবী নাই। যেহেতু মুরীদগণ হচ্ছে নববধু এবং হুরগণের তুল্য। তারা আবদ্ধ আছে শিবিরে। হিফাজত করে যাচ্ছে স্বীয় দৃষ্টিকে হরেক দৃশ্য ও মজলিশ হতে। তাই তাদের শায়খ যে দৃশ্যের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবেন সে দিকেই তাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক। শায়খকে একথা স্মরণ রাখতে হবে, কোন মুরীদের অন্তরে তাঁর গুরুত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে ভাটা পড়তে দেখলে তিনি এ জাতীয় মুরীদকে স্বীয় তারবীয়াতের ছায়াতল থেকে শাসন করার মাধ্যমে বের করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সে সর্বাপেক্ষা বড় দুশমন যথা কবি বলেন-

اَحْذَرْ عَدُوَّكَ مَرَّةً + وَاحْذَرْ صَدِيقَكَ اَلْفَ صَرَّةٍ

"শত্রু হতে বাঁচো মাত্র একবার,
মিত্র হতে সতর্ক হও কিন্তু হজার বার"

فَلَرُبَّمَا اِنْقَلَبَ الصَّدِيْقُ + فَكَانَ اَعْرَفُ بِالْمُضَرَّةِ

"অনেক ক্ষেত্রে মিত্র হয়ে যায় শত্রু ,
ক্ষতি সাধনে সে-ই হয় সুচতুর তীব্র ।

এ জাতীয় লোক মুরীদ হওয়ার যোগ্য নয় বিধায় শরীয়তের বাহ্যিক অনুশাসন এবং সাধারণ ইবাদতে মনোনিবেশ করা কর্তব্য। এ জাতীয় লোক এবং নিজের অন্যান্য মুরীদ ও সম্পর্কীয়দের মাঝখানে কোন প্রকার যোগাযোগ ও সম্পর্ক অবশিষ্ট রাখা সঙ্গত হবে না। কারণ বহিষ্কৃত এ ব্যক্তিটির চেয়ে চরম ক্ষতিকর অন্যান্য মুরীদের বেলায় দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না।

শায়খের তিন মজলিস

(১) সাধারণ মজলিস ।
(২) সমস্ত মুরীদ ও শিষ্যদের মজলিস ।
(৩) প্রত্যেক মুরীদের উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন মজলিস।

সাধারণ মজলিস যেটি হবে সেটিতে কোন মুরীদকে অংশ গ্রহণ করতে না দেয়া। দিলে তাদের জন্য অবর্ণনীয় ক্ষতি চাপিয়ে দেয়া হবে।(১)

৭ নং শর্ত ঃ সধারণত মজলিস – সাধারণ মজলিস সম্পর্কে শায়খের প্রতি শর্ত এই যে, অল্লাহর সাথে বান্দার মুয়ামালা এবং কারামত অর্থাৎ বান্দার সাথে আল্লাহর মুয়ামালা নিয়ে আলোচনা রাখা। আলোচনা রাখবেন এই মজলিসে তিনি শরীয়তের বিধ –বিধানের সংরক্ষণ ও সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে। যেগুলোকে যথাযথ পালন করেছেন আল্লাহ্ পাকের খাছ খাছ বান্দাগণ। এমজলিসে এর অতিরিক্ত কিছু বলা তাঁর জন্য সমিচীন হবে না। **অর্থাৎ ঃ** তাসাওউফের সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং কাশফ সম্পর্কীয় যা কিছু বিশেষ মজলিসে আলোচ্য বিষয়, সেগুলো সাধারণ মজলিসে বর্ণনা করতে না যাওয়া। যেহেতু এগুলো তারা বুঝবে না এবং এসব তাদের জন্য অবশ্য ক্ষতিকর।

টীকা ঃ (১) সাধারণ মজলিসে সাধারণতঃ মরিফাতের আলোচন করা হয় না। যেমন দুনিয়াদারদের সাথে আলোচনা রাখা তাদের মুবাহ বিষয়াদি সম্পর্কে। কিংবা সাধারণ নেককার বান্দাগণের সাথে আলোচনা রাখা হয় তরীকতের ভূমিকা ও প্রাথমিক বিষয়াদি সম্বন্ধে। সুতরাং সাধারণ মজলিস দুই ধরণের হয়। প্রথম প্রকারটি বেশী স্পষ্ট বিধায় শায়খ কেবল সেটিকেই বর্ননা করেছেন।

৮ নং শর্ত ঃ বিশেষ মজলিস সম্পর্কে–মজলিসটিতে শায়খের জন্য করণীয় হবে, তিনি যিকির, খুল্‌ওয়াত বা একাকিত্ব মুজাহাদা বা সাধনা এবং এ সবের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এবং আনুষঙ্গিকতা সম্পর্কীয় বর্ণনায় তাঁর আলোচনাকে সীমিত রাখা, যা আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত বাণী হতে প্রস্ফুটিত হচ্ছে – وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থা ঃ 'যারা আমার হুকুম পালনে সাধনা করবে, তাদেরকে আমি আমার হিদায়াতের পথের দিশা দিয়ে থাকি।"

৯ নং শর্ত ঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত মজলিস সম্পর্কে শায়খ তাঁর মুরীদকে একা একা বসার পর তাঁর জন্য কর্তব্য হবে, তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা। মুরীদ তার অবস্থা পেশ করার পর তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে এটি নিতান্তই নিম্নমানের অবস্থা। মুরীদকে তার অসক্রিয়াতা ধরিয়ে দিতে হবে আর মনে বড়াই কিংবা অহমিকা যেন না আসে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিতে হবে, শায়েস্তাও করতে হবে।

অনুবাদক হযরত মুফতী শফী সাহেব(রহঃ) বলেন উপরোক্ত ব্যবস্থাই ছিল আসল তালীম ও প্রশিক্ষণ। কিন্তু আজকাল যেহেতু সর্বব্যাপী ছেয়ে চলেছে বেহিম্মতী ও দুঃসাহসিকতা, এদিকে মানসিক অনাসক্তি তো আছেই। তাই মুরীদের উপস্থাপিত অবস্থাকে যদি হেয় করে বুঝানো হয় তখন অশংকা রয়েছে এ মুরীদ ভগ্ন মনোবল হয়ে একে বারে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার। কাজেই উৎসাহ–উদ্দীপনা দ্বারা অনুপ্রাণিত করেও তার থেকে কাজ নিতে হবে। তবে মাত্রাতিক্রম করে তাকে ফুলিয়ে দেয়াও উচিত হবে না। সম্ভবতঃ উপরোক্ত বাণী হযরত শায়খ অহমিকার থেকে মুক্ত রাখার নিমিত্তই রেখেছেন। তা না হলে আকাবিরদের থেকে মুরীদানের কর্মের উপর মুবারকবাদ প্রদানের দৃষ্টান্ত ও বর্ণিত আছে। মুরীদ যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন তাঁরা কখনো তাও ব্যক্ত করে দিয়েছেন। পংক্তিটি এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রণিধান যোগ্য মনে করি –

در طریقت هرچه پیش سالك اید خیراوست

অর্থাৎঃ তরীকত ও সুলুকের পথে সালিক বা এ পথের যাত্রীর সামনে যা কিছু আসে, তার কল্যানার্থেই এসে থাকে।"

মুরশিদুল মুরশিদীন, সাইয়্যেদী, হেকীমুল উম্মত হযরত থানবী কুদ্দিসা সিররুহুর তারবিয়াতেও আজকাল (তদানীন্তন) অনীহা ভাবাপন্ন অনাসক্তি এবং দুঃসাহিকতার পরিস্থিতিতে এ উৎসাহের দিকটির দিকে দৃষ্টি রাখা হয়

বিশেষ ভাবে সাথে সাথে অধিকাংশ অবস্থা ও স্পৃহার প্রেক্ষাপটে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, কোন তালিব বা শিক্ষার্থী এটিকে যেন অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে না ভাবে। অর্থাৎ এমন অবস্থা হওয়াটা তো প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু কেবল তা -ই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়। যদ্দরুন মুরীদ ও তালিবকে তার অহমিকা বা আত্মগৌরবে বিলীন হয়ে যেতে দেয়া হয় না। হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল আরবী (রহঃ) উপরোক্ত বাণী দ্বারা একাথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

শায়খ কর্তৃক নিজের একাকিত্বের জন্য কিছু সময় নির্দ্ধারণ করা

শায়খের জন্য একান্ত অপরিহার্য যে, তিনি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ততা কায়েমের নিমিত্ত কিছু সময়কে নির্দ্ধারণ করে নিবেন। বিরাজমান অবস্থার উপর আস্থা রাখা সঙ্গত হবে না। এ জন্যই নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন। আমার কখনো কখনো আল্লাহর সাথে এমন সম্পৃক্ততা জুড়ে বসে যে, আমার সাথে একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কারো সম্পর্কের তখন সুযোগ বা অবকাশ থাকে না। আর এটির রহস্য হচ্ছে নাফসের মধ্যে আল্লাহকে হাযির রাখার ক্ষমতা এসেছিল –এক দীর্ঘকালব্যাপী হাযির করার সাধনা করার মাধ্যমে। তখন আল্লাহকে ছাড়া অবশিষ্ট যত কিছু যাহিরী ও বাতেনী বস্তু আছে–তা এই নাফসে বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত ছিল। সুতরাং অনুরূপ স্বাভাবিকতার প্রতিকূলে সাধনা করা বিধেয়। অর্থাৎ এমনটি যেন না হয় যে, ধীরে ধীরে আল্লাহকে হাযির রাখার প্রশিক্ষণে কলিমা কিংবা অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। এসচেতনতা ও হুশিয়ারী। বিশেষ করে সে ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে, যার স্বভাব ও প্রকৃতির আকর্ষণ হুযুর বা আল্লাহকে হাযির রাখার ব্যতিক্রমধর্মী হয়।

সুতরাং শায়খ যখন প্রত্যহ নিয়মিত মুরীদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে না পারেন, যা পর্যবেক্ষণের অভ্যাস ও সাধনার বদৌলতে তার অর্জিত হয়েছিল এবং হুযুরী তথা আল্লাহ পাককে অন্তর চোখের সামনে হাযির রাখার প্রয়াস, তখন তা বিচিত্র নয় যে, পূর্বের স্বভাব বিরাজমান প্রকৃতি তাকে নিজের দিকে টেনে নেবে এবং আকর্ষিত করে তুলবে। ফলে খুলোওয়াত ও একাকিত্বে তার মন আকর্ষিত হবে না। স্বভাব বা প্রকৃতির পরিপন্থী যতসব আমলও সাধনা আছে সবগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাই হচ্ছে অবিরাম মুজাহাদাহ ও প্রাত্যহিক সাধনা। অর্জিত হয়ে গেছে বলে সে সাধনা ও মুজাহাদাহ যেন বর্জিত না হয়ে যায়। কেননা অর্জিত জিনিসটি খুবই তাড়াতাড়ি বিদূরীত হয়ে যায়। আমরা বহু আল্লাহ ওয়ালাকে দেখিছি, তার স্বীয় মর্যাদা হতে নিম্নে পতিত হয়ে গিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে এবং আমাদেরকে তা থেকে নাজাত ও নিষ্কৃতি দান করুন। আমীন ! আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

– إِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَامَسَّهُ الشَّرُّ جَذُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا –

অর্থাৎ – মানুষকে খুবই ক্ষীণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মানুষ যখন বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন আত্মহারা ও দূর্বল হয়ে পড়ে। আর যখন সামর্থবান হয়ে ওঠে, তখন কৃপণ হয়ে যায়।"

এ আয়াতে অল্লাহ পাক নফ্স বা প্রবৃত্তির সার্বিক ত্রুটি –বিচ্যুত সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আর এটি বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, নফসের যত গুণাবলী আছে সেগুলো মানুষের স্বভাবজনিত প্রকৃতিগত নয়। এজন্য এগুলোর সংরক্ষণ একান্তই জরুরী।

১০ নং শর্ত ঃ শায়খের শর্তসমূহ হতে এটিও একটি যে যখন মুরীদ তাঁর কাছে স্বীয় স্বপ্ন বয়ান করে কিংবা নিজের কাশ্ফ ও মুশাহাদাহার কথাও ব্যক্ত করে, তখন সেটির রহস্য মুরীদের সামনে ফাস না করা। কিন্তু তাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দেয়া জরুরী হবে, যদ্বারা সেটির অপকারিতা দূরীভূতঃ হওয়ার পথ পেয়ে যায়। আর এ ব্যবস্থা তখনি সাম স্যপূর্ণ হবে যখন তার খাব কিংবা মুশাহাদাহ্ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কিংবা তাকে উচ্চ মর্যদাভিমুখী করে দেয়। আর যখন মুরীদের খাব কিংবা কাশফে উপকারের কোন দিক বিদ্যমান থাকে (তখনও)। অর্থাৎ সেটির কারণে মুরীদের মনে তাকাব্বরী পয়দা না হয়। কিংবা কাশফের রহস্য তল্লাশীর পেছনে সময় কাটাবে না। এ জন্যই শায়খ কোন মন্তব্য না করাই শ্রেয়।

আর শায়খ মুরীদের খাব কিংবা কাশফ ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে যদি কোন প্রকার মন্তব্য কিংবা বক্তব্য রাখেন, তবে এ পীরসাহেব অসুবিধা সৃষ্টি করবেন। কেননা মুরীদের অন্তর থেকে সে পরিমাণ শায়খের (১) সম্মান হ্রাস পাবে। যে পরিমাণ তার থেকে বক্তব্য প্রদানে বেপেরোয়া প্রদর্শন করেছেন। আর যে পরিমাণ সম্মান হানি হবে সে পরিমাণ অমান্যতার আচররণে দেখাবে। আর যখন পীর সাহেবের হুকুম লংঘন করতে থাকবে, তখন আসলেও ত্রুটি দেখা দেবে। তদুপরি যখন আমল থাকবে না তখন আল্লাহ পাক এবং এ মুরীদের মাঝখানে হিজাব বা অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে সে মারদূদ ও বিপথগামী হয়ে যাবে অনুশাসনের সীমারেখা থেকে ছিটকে পড়েবে সে। অতঃপর সে কুকুর সদৃশ হয়ে যাবে। আমরা এমন লোক

এবং সমস্ত মুসলমানের স্বার্থে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ইসতিগফার করছি। আল্লাহুম্মা আমীন।

১১ নং শর্ত ঃ শায়খের জন্য অপর শর্ত এই যে, তিনি তাঁর মুরীদকে কারো কাছে বসতে না দেয়া। হ্যাঁ সেসব পীর ভাইদের কথা ভিন্ন যাঁরা মুরীদের সাথী হয়ে এই পীরের ছায়াতলে সমবেত হয়ে তারবীয়াত গ্রহণ করছেন। এবং এদের দ্বারা তার হিদায়াত হওয়ার সম্ভবনা আছে। মুরীদকে অন্য কারো সাথে মিশতে দেয়া যেমন ঠিক হবে না, অনুরূপ কাউকে এ মুরীদের সাথে এসে মিশতে দেয়াও ঠিক হবে না। কারো সাথে ভাল–মন্দ কোন কথা তাকে বলতে দেয়াও অনুচিত। মুরীদের যদি কোন হাল পেশ আসে কিংবা কারামাত প্রকাশ পায় তবে স্বীয় তরীকতের ভ্রাতাগণের কারো কাছেও তা ব্যক্ত করা চাই না। এসব ব্যাপারে শায়খ মুরীদকে বেপরোয়া বা স্বাধীনতা প্রদান করলে তার ব্যাপারে নিতান্তই ক্ষতি প্রদর্শন করা হবে।

১২ নং শর্ত ঃ রাত্র-দিনে একবারে বেশী শায়খ তাঁর মুরীদানদের সাথে মজলিশ করা অসঙ্গত। (১) শায়খ স্বীয় কোঠরীতে নীরব ও একাকী থাকা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

তিনি এমন নীরব কোঠরীতে একাকিত্ব গ্রহণ করবেন যেখানে তাঁর সন্তানরাও কেউ যেতে, না পারে। অবশ্য যাকে তিনি অনুমতি দান করবেন তাঁর কথা স্বতন্ত্র। বরং একেবারে কাউকে আসার অনুমতি প্রদান না করাই উত্তম। তাহলে সৃষ্টির কারো আকৃতি দেখা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। কারণ কারো দর্শন হলে তার অন্তারাত্মার গতি ও প্রভাব অনুপাতে ক্রিয়ালাভ করে। এমনকি শায়খের অবস্থা অনেক সময় এমনও হয়ে যায়, আগন্তুককে দেখার সাথে যে, তাঁর অবস্থায় ও পরিবর্তন এসে যায়। অথচ প্রত্যেক শায়খ তা চিনতেও সক্ষম হন না। বস্তুতঃ শায়খ তাঁর মুরীদগণের

সাথে সাক্ষাত দেয়ার জন্য একটি জায়গা নির্দ্ধারণ করা একান্তই জরুরী। যেখানে তিনি তাদের সাথে ওঠা–বসা এবং আলাপ আলোচনা করবেন।

টীকা ঃ (১) যেহেতু খাব কিংবা কাশফের তত্ব প্রকাশ করা একটা নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিস। এইজন্য নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলা সম্ভ্রমহানিতাকেই তরান্বিত করে।

টীকা ঃ (১) তাহলে মুরীদগণ তাদের শায়খের ব্যাপারে অসাবধান ও অসতর্ক হবে না এবং বেশী সময় তারা আপন কর্তব্যে নিয়োজিত থাকতে পারবে।

১৩ নং শর্ত ঃ শায়খের করণীয় সমূহ হতে ইহাও একটি যে, তিনি স্বীয় তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক মুরীদের জন্য নিরবতা অর্জনের সুবিধার্থে একটি নির্জন কুঠরী ঠিক করে দেবেন। যা একমাত্র উক্ত মুরীদের জন্যই সংরক্ষিত হবে। তাতে অন্য কারো আনা–গোনা না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কোন মুরীদের জন্য কোন নীরব কোঠরী নির্দ্ধারণ করা হলে শায়খের জন্য সমীচীন হবে যে, প্রথমে তিনি-ই সেখানে প্রবেশ করবেন। (১) এবং প্রথমে সেটিতে তিনি নিজে দুই রাকয়াত নামায় আদায় করবেন। শায়খকে তখন খুব খেয়াল দিতে হবে মুরীদের আধ্যাত্মিক অবস্থার দিকে, স্বভাব –প্রকৃতির দিকে এবং তাঁর আনুষঙ্গিক অবস্থাদির দিকে। অতঃপর শায়খ উক্ত দুই রাকয়াত নামাযে এমন একাগ্রতা সৃষ্টি করবেন যা মুরীদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

সম্ভবত ঃ উক্তিটি মর্ম এই যে, শায়খ সাধারণতঃ আবুল ওয়াক্ত তথা পরিবেশ নিয়ন্ত্রকারী হয়ে থাকেন। সুতরাং তাতে তিনি এমন পরিবেশের সৃষ্টি করবেন যা সমসাময়িক অবস্থার সাথে মিল খায়, উপযোগী প্রমাণ হয়। অতঃপর তিনি মুরীদকে তার কোঠরীতে নিরবতা হাসিলের নিমিত্ত বসিয়ে দেবেন। শায়খ যদি ঠিক এভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহলে মুরীদের জন্য তার কামিয়াবী ও বিজয়ের দ্বারা উম্মুক্ত হওয়া অবধারিত হয়ে যাবে। আর এর বরকতে মুরীদ অতি সত্বর মঙ্গলময় ও কল্যাণ প্রাপ্ত হয়ে উঠবে।

শায়খের জন্য করণীয় ইহাও যে, মজলিস ব্যতীত পরস্পর একত্রিত হতে না দেয়া। এ ব্যাপারে শায়খ কোন প্রকার ক্ষমা বা নমনীয়তা প্রদর্শন করা মুরীদানদের পক্ষে অনিষ্ট করারই নামান্তর।

শায়খে আকবর হযরত মুহিউদ্দীন ইবনুল 'আরাবী (রহঃ) প্রণীত কিতাব "আদাবুশ শায়খ ও শারায়িতিহি" কিতাবের সারাংশ এটুকুই। এ মর্যাদাপূর্ণ কিতাবখানা আমার উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করার সৌভাগ্য হয়। তাও নিতান্ত তাড়াহুড়া ও ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে।

সমস্ত প্রশংস একমাত্র আল্লাহ্‌র। যাঁর মহানত্ব ও পরাক্রমশালীতার দ্বারা সব কর্মের পূর্ণতা ও আন্দায পাওয়া সম্ভব। কিতাবখানার অণূদিত পাড়ুলিপি সমাপ্ত হয় ১৩৪৯ হিজরী সনের ১০ই যিলহজ্জ তারিখে।

দীন–হীন হতভাগা

মুহাম্মাদ শাফী দেওবন্দী–

টীকা ঃ (১) এ ব্যবস্থা এমন শায়খদের বেলায় প্রযাজ্য হবে, যারা অবসর থাকে। আর যাদের অন্য কোন প্রকার দ্বীনি ব্যবস্থা থাকে তারা বিকল্প পথ বেছে নিতে হবে, যেখানে সে দুই রাকয়াত নামাযের বিশেষত্ব আছে। আর তা হচ্ছে বিশেষ অবস্থা বিশেষ ব্যবস্থা যা নামায দুই রাকয়াত ছাড়াও সম্ভব।

সমাপ্ত